৮ পাতা বিশেষ ক্রোড়পত্রসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা

নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

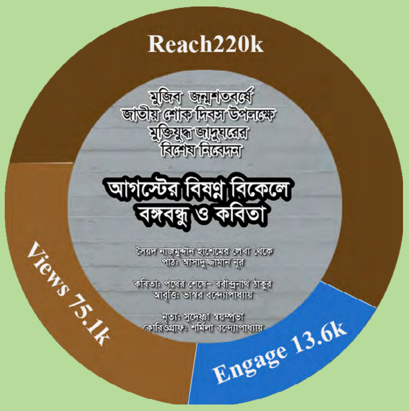

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ডিজিটাল পথচলা

নবযুগের যাত্রা

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধারণ-বাহনের ব্রত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দুই যুগ ধরে কাজ করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেশের আর দশটি জাদুঘরের মতো নিছক কোন জাদুঘর নয়, পোয়া শতাব্দির পথপরিক্রমায় এটি হয়ে উঠেছে দেশের অন্যতম জাতীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে।

দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় সংহত এ জাদুঘর শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সেগুনবাগিচা থেকে আগারগাঁও– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলা দেখলে এর উন্মেষ-ইতিহাস যেকোন স্বপ্নচারী মনে প্রেরণা যোগায়। তারুণ্য বান্ধব এ জাদুঘর নবযুগের ডিজিটাল যাত্রায় সামিল হবে এটা খুব স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা।

এখানে লক্ষ্য করলে দেখো যায়, অনেক আগে থেকে জাদুঘরের নিজস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে। ইতিমধ্যে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকেরের নেতৃত্বে আমরা আমাদের ফেসবুক যাত্রা সূচনা করেছে। খুব অল্প সময়ের (১ মাস) মধ্যে আমরা প্রায় হাজার সংখ্যক লাইক ও ফলোয়ার অর্জন করেছি। এর মধ্যে ট্রাস্টি মফিদুল হকের উদ্যোগে আমাদের দু'টি ভিডিও কন্টেন্ট সপ্তাহব্যাপি ফেসবুকে বুস্ট করা হয়। বুস্টের ফলাফল লক্ষণীয়।

পরীক্ষামূলক ফেসবুক বুস্টের ফলাফল– এক সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের কাছে জাদুঘরের কন্টেন্ট রিচ করতে সক্ষম হয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যমের পরিভাষায় এটাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, এ্যাওয়ারনেস হিসেবে। একইভাবে ডিজিটাল মিডিয়ামের এনগেজম্যান্ট (লাইক-কমেন্ট-শেয়ার) ও গ্রোনেস (ভিউ)-এর ক্ষেত্রে আমরা অনেক ভালো ফলাফল অর্জন করতে পেরেছি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

জাদুঘরের অফিসিয়াল জি-মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে ২০১২ সালে হতে একটি ইউটিউব চ্যানেল খোলা রয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ অচলাবস্থায় আমরা সেটি কার্যকর করি নতুন ভাবে। বর্তমানে আমাদের চ্যানেলটিতে ১৮০ জন সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। নিয়মিত কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারলে এবং তা বুস্ট করা হলে উত্তরোত্তর সাবস্ক্রিপশন বাড়ানো সম্ভব। সম্প্রতি জাদুঘরের একটি অফিসিয়াল **ভিমিও** অ্যাকাউন্টও খোলা হয়েছে। অফিসিয়ালি ইনস্ট্রাগ্রাম, লিংক্ষিন, টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এছাড়াও অনলাইনে

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জিয়াউদ্দিন তারিক আলী প্রয়াত হন। তার স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র দেখুন

'আ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল' নির্মাণের নেপথ্য কথা

'মোহাম্মদ হোসেন'কে আবিষ্কার করা হয় ২০১৮ সালের এক ঝড়ের দিনে, কক্সবাজারের উখিয়া থানার কুতুপালং এলাকার মধুছড়া ক্যাম্পের এক দোকানে। কুতুপালং-এর অন্যান্য ক্যাম্পের তুলনায় এই মধুছড়া ক্যাম্পটি তুলনামূলকভাবে শান্ত আর পরিচ্ছন্ন। এনজিও, সরকারি সংস্থা বা রিফিউজিদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা এখানে অনুপস্থিত। মেইনরাস্তা থেকে ভেতরে আর নতুন পাহাড়ের গায়ে আবাস বলে, এখানে শব্দহীন কিছু মুহূর্ত পাওয়া যায়। ফলে, কান পাতলেই দুর থেকে শোনা যেতে পারে মোহাম্মদ হোসেনের মেন্ডোলিনের সুর। হয়তো কোন শিশুদের খেলা ঘরে, দোকানের আড্ডায় নয়তো নিজের ঘরের সামনের রুমে বসে কাউকে শেখাতে গিয়ে - সে বাজিয়ে চলেছে, একটানা। মোহাম্মদ হোসেন মেন্ডোলিনের সুরে জীবনের কথা বলে - তার নিজের কথা, নিজগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের কথা আর তার প্রিয় স্বদেশ আরাকানের কথা। সুর, গান আর কথার নানা মূর্ছনায় রচিত হতে থাকে বার্মিজ সামরিক জান্তার নিপীড়নের কাহিনী, অত্যাচারের বর্ণনা। লোকে এসব গান শুনতে আসে। মোহাম্মদ হোসেনের গানে তারা ফেলে আসা জন্মভূমিকে স্মরণ করে, কাঁদে। এরপর নিজ দেশে ফিরে যাবার স্বপ্ন - আকাংখা নিয়ে ফেরে কুতুপালং, বালুখালি, লেদা, জাদিমুরা, হাকি-মপাড়াসহ বিস্তৃত রিফিউজিদের জন্য নির্মিত বাঁশ-তারপলিনের ঘরে। বলা হয়, এটাই পৃথিবীতে শরণার্থীদের জন্য তৈরি বৃহত্তর ক্যাম্প যেখানে ২০১৭ সালে আসা প্রায় দশ লক্ষ রিফিউজি আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আমি এর আগেও একবার কুতুপালং ক্যাম্পে যাই, অন্য একটি কাজ করতে। তখন নানা ক্যাম্প ঘুরে দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষ কিভাবে সহায় সম্বল হারিয়ে, আরাকানের নিজ ভূমি ছেড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। সুজন ভট্টাচার্য সেখানে একটি মানবাধিকার সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। তার কাছেই প্রথম নির্বাসিত এই ম্যান্ডোলিন বাদকের গল্প শোনা। হোসেনের সাথে যখন আমাদের আবার দেখা হয়, সে এক দোকানে লুডু খেলছে

মোবাইলে। তার নিজের মোবাইল নেই, এসব সে রাখে না। পড়তে বা লিখতেও জানে না। সে শুনে বা মনে মনে কথা বানিয়ে গান করতে পারে, সুর করে, মনে রাখে। তার গান অন্যেরা মোবাইলে রেকর্ড করে রাখে, কিন্তু তার নিজের কাছে কোন সংগ্রহ নেই। হোসেন তার গল্প বলে যায়, কখন কিভাবে সে মায়ানমারের বুচিদং এলাকা থেকে পাহাড়-নদী-সাগর পেরিয়ে পরিবার নিয়ে কুতুপালং ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে।

আমি চেয়েছি এই 'নির্বাসিত মেন্ডোলিনের' গল্পটি একটু ব্যতিক্রম হোক। রোহিঙ্গা নির্যাতন, মায়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নিপীড়ন - এসব পৃথিবীর মানুষ কমে বেশি নিউজ বা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে জানতে পেরেছে। এমনকি জাতিসংঘ ভিত্তিক সংগঠনগুলোও এসব দিককে সঙ্গত কারণেই প্রাধান্য দিয়েছে। প্রথম থেকে মাথায় ছিল মোহাম্মদ হোসেনের গল্পটা হবে, মেন্ডোলিন নিয়ে এই ক্যাম্পে তার নির্বাসিত জীবনের গল্প। কিভাবে মায়ানমারের একজন দিনমজুর নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এখানে এক পেশাদার শিল্পী'তে পরিণত হয়েছেন। তাই যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'এক্সপজিশন অফ ইয়ং ফিল্ম ট্যালেন্ট, ২০১৯' প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করি, তখন প্রস্তাবনাটি এভাবেই উপস্থাপন করি। বিশ্বাস ছিল, ঠিক যে ভাবনায় গল্পটি নির্মাণ করতে চাই তা হয়তো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আগ্রহী করে তুলবে এবং তাইই হয়। তথ্যচিত্রের প্রস্তাবনা প্রকল্পটি বিচারক, মেন্টর এবং জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সর্বসম মতামতের ভিত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার লাভ করে। এবং পরবর্তী সময়ে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজটি শুরু করি।

ভেবেছিলাম কাজটি করতে খুব বেশি সমস্যা হবে না। অনেকেই তো কাজ করছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। প্রতিদিন ছোটবড় বিভিন্ন সংস্থার ভিডিও ইউনিট। কিন্তু ক্যাম্পের ভিতরের এলাকায় নিয়মিত

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স (৭-৩০ আগস্ট ২০২০)

টানা সপ্তমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) মাসব্যাপী জেনোসাইড ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে গত ০৭-৩০ অগাস্ট পর্যন্ত প্রথমবারের মতো অনলাইন-এ কোর্সটি পরিচালনা করা হয়েছে দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৮ জন বাংলাদেশী এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই শিক্ষার্থী ছিলেন এবং সর্বমোট ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

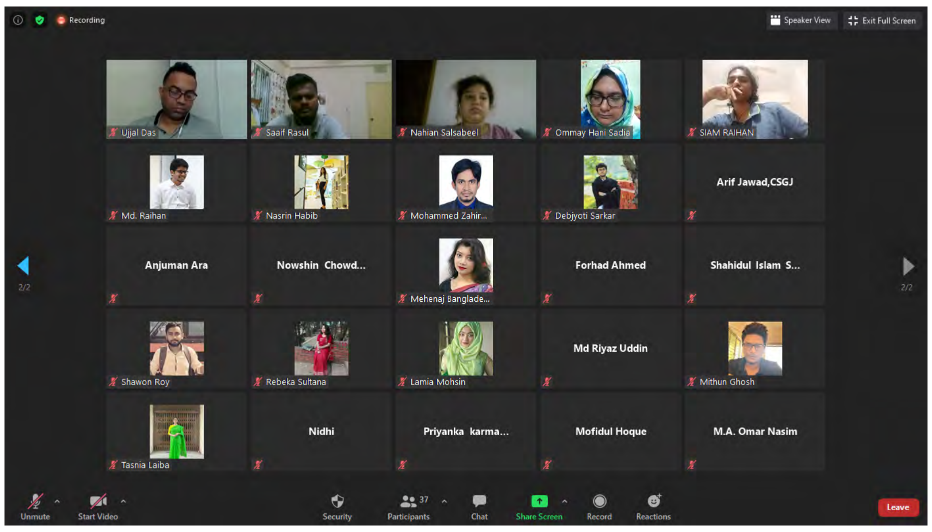

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি উল্লেখযোগ্য। কোর্সটিতে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যান্যদের মাঝে ছিলেন আইনজীবী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী ইত্যাদি আইনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, উন্নয়ন অধ্যয়ন, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, নারী ও জেন্ডার, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কোর্সটি পরিচালনা করা হয়

আগস্টের প্রতি শুক্র ও শনিবার বিকেলে জেনোসাইড ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ বক্তারা ক্লাসগুলো নিয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমিরিটাস অধ্যাপক ড আহরার আহমেদ (ব্লাকহিল বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা), ড এম সঞ্জীব হোসাইন (টিচিং ফেলো, ওয়ারউইক ল স্কুল), হারুন নাকাশিবা (, বাংলাদেশ), ড তেরেসা দ লাঙি (জেনোসাইড স্কলার, আমেরিকা), শাহরিয়ার কবির (প্রেসিডেন্ট, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি), ড টমাস লাচওস্কি (আইন অধ্যাপক, পোল্যান্ড), ড সামিনা লুৎফা (সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্যাট্রিক বার্জেস (অস্ট্রেলিয় আইনজীবী ও প্রেসিডেন্ট, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস), ইরেনে ভিক্টোরিয়া ম্যাসিমিনো (আর্জেন্টিনিয়ান আইনজীবী), ড এম এ হাসান (বিজ্ঞানী ও আহবায়ক, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি), ইমরান আজাদ (প্রভাষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস) প্রমুখ। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগ, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর উপর গণহত্যা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ও তাদের বিশ্লেষণ, ট্রাঞ্জিশনাল জাস্টিস, গণআদালত, ন্যায়বিচার রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বক্তারা আলোকপাত করেছেন এছাড়াও সমসাময়িক যুদ্ধ ও সংঘর্ষ নিয়ে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি তাদের আইনি ব্যাখ্যা এবং তার বিচারের নানা দিক নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বক্তারা কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করতে কেমন লেগেছে, এই প্রশ্নে উম্মে হানি সাদিয়া (আইন শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস) বলেন, "পুরো কোর্সটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আয়োজন করা হয়েছে করোনাকালীন এই দিনগুলোতে যখন সবকিছু অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন, এমনি এক অবস্থায় এই কোর্সটিতে অংশ নিয়ে সময়টি সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছি বলে আমি মনে করি" প্রতি সেশনে বক্তারা ত্রিশ মিনিটের রেস্টুরে দেয়ার পাশাপাশি পরবর্তী ১৫ মিনিট অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন নয়াদিল্লি, ভারতের সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ জানিয়েছেন তিনি এই কোর্সটি পুরোপুরি সন্তুষ্ট "আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি কারণ এই কোর্সটিতে অংশ নেয়ার ফলে দেশ বিদেশের নানা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনার সুযোগ হয়েছে, তাদের কাজের ক্ষেত্রগুলো বিস্তারিত আকারে জানতে পেরেছি যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে", তিনি আরো বলেন নতুন আঙ্গিকে মাসব্যাপী এই সার্টিফিকেট কোর্সটি আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঢাকার বাইরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একারণেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সাদিয়া নওরীন কোর্সটি করে অত্যন্ত আনন্দিত তিনি বলেছেন, "আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা-কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এতদিন কোর্সটি করা সম্ভব হয়নি এবার অনলাইনে আয়োজন করার কারণে আমার মতো অনেকেই ঢাকার বাইরে থেকেও কোর্সটিতে অংশগ্রহনের সুযোগ পেয়েছে বলে কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই" সিএসজিজে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অংশগ্রহণকারীদের ক্লাসগুলোতে ৮০% উপস্থিতি নিশ্চিত করা, এবং কোর্স শেষে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কোর্স হতে লব্ধ জ্ঞান যাচাই করা তুমুল ঝড়বৃষ্টির কারণে মাঝে মাঝে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাহত হওয়া, ঘরে বিদ্যুৎ না থাকা, করোনা-আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের সামলানো- এমন শত প্রতিকূলতা পার করে অত্যন্ত দৃঢ়তা আর সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণকারীরা ক্লাসগুলো করেছেন বলেই আজকে আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক তাদের প্রত্যেককে

ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানাচ্ছি আশা করি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবো এবং সবার সাথে সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ হবে আমাদের কাজের ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সকলের সম্পৃক্ততা আশা করছি।

নওরিন রহিম

কোঅর্ডিনেটর, সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

আ ম্যান্ডোলিন ইন

কাজ করার অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম দেখা গেল । সাধারণভাবে শুটিং ইউনিট নিয়ে লম্বা সময় অবস্থান করা কঠিন। রোহিঙ্গারা এ ক'বছরে দেশি বিদেশী ক্যামেরা, শুটিং ইউনিট দেখেও অভ্যস্ত হয় নাই। বরং তাদের কৌতূহল-উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। ট্রাইপডে ক্যামেরা বসালেই অল্প সময়ে লোকজনের ভীড় জমে যায়। নানা রকম সংস্থার লোকজন জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদিও বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবসন অধিদপ্তরকে অবহিত করনপূর্বক, তাদের অনুমতিপত্র ছিল আমাদের। যেকারণে, এই শুটিং এ বিন্দুমাত্র সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি প্রশাসনিকভাবে। কিন্তু সমস্যা ছিল, লোক সমাগম ব্যবস্থাপনা। অল্প জায়গায় শত শত রোহিঙ্গা। একে তারা রিফিউজি, তার মধ্যে তারা সাধারণভাবে শিক্ষাবিহীন, অনভ্যস্ত। তাদের ম্যানেজ করে নিভৃতে কাজ করা অসম্ভব বটে। আমরা একটা ছোট টীম আর তুলনামূলক ভাবে জাঁকজমকহীন কারিগরি সাপোর্ট নিয়ে কাজ করি। শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারন, ক্যাম্পের শিশু, নারী বা বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে নীরব থাকতে বলা, তাও আবার শুটিঙের প্রয়োজনে, ছিল একেবারে অর্থহীন। হোসেনের নিজেরও কোন ইন্টার্ভিউ বা ক্যামেরার সামনে কথা বলার অভ্যস্ততা ছিল না। সে তার নিজের মতোই বলে যেতো। কোথায় থামতে হবে বা কোন কথা গুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে, বুঝতে পারতো না। আমিও জোর দিতাম না। কারণ, আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে কিছু করার বা বলিয়ে নেয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। সাধারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমি গল্পটা ধরার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটা ছিল, সময়ের সাথে সাথে মোহাম্মদ হোসেনের ক্যাম্প লাইফের পরিবর্তনকে এড্রেস করা। লক্ষ মানুষের এই ক্যাম্পে সদা ঘটনা-দুর্ঘটনা বিরাজ করতে থাকে। যদিও তারা এখানে সরকার ও জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতার মধ্যে ছিল। খাদ্য, সংস্থান, চিকিৎসা, বস্ত্র - সব মিলিয়ে মানবাধিকার বা সরকারি সংস্থা গুলোর কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া, ঝড়বৃষ্টি বা অত্যাধিক গরম, প্রতিকূল পরিবেশ বা নানা ঘটনাপ্রবাহ তাদের নিত্যদিনের জীবনকে অস্থির ও অসহনীয় করে তুলতো। তার উপর রোহিঙ্গাদের রিফিউজি মনোজগৎ প্রায়শই অস্থির , কুসংস্কার আর নানা গুজবে ভরা। যেকোন মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত খবর বা ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ফলে একই মাসে কয়েকবার করে যেতে হয়েছে। টানা অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে সেই আবহের মধ্যে হোসেন ও তার পারিপার্শ্বিক ক্যাম্প জীবনের বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরতে। অনির্ধারিত শুটিং শিডিউলের কারণে কারিগরি সহযোগিতার লোকজন বারবার বদলে যেত। ক্যাম্পে সাধারণভাবে নিউজ বা এনজিও'র কাজে থাকা-যাওয়া মিলে অনেক সুবিধা থাকে, যা এই তথ্যচিত্র নির্মাণে আমাদের পক্ষে মেইনটেইন করা সম্ভব ছিল না। তবে এক্ষেত্রে আমাদের ভালো সাপোর্ট ছিল, চাকরি সূত্রে সুজন ঐ ক্যাম্পে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অতিবাহিত করতো। তার কাছে নির্দেশনা ছিল - কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ক্যামেরা বন্দি করতে হবে। ফলে, তার পক্ষে অনেক মুহূর্ত তাৎক্ষনিকভাবে মোবাইলের ক্যামেরায় ধারণ করা সম্ভব হয়।

এই ফিল্মের মুল ফোকাস ছিল, হোসেনের রিফিউজি জীবন প্রধান রেখে শরণার্থী ক্যাম্পের পরিবেশ, তার পরিবর্তন, মানুষ আর প্রকৃতিকে তুলে আনবো। কাজটি করতে গিয়ে দেখি, শরণার্থী পরিবেশে ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সমষ্টি'র জীবনের কঠিন নিয়তি ও বাস্তবতা - একে অপরকে প্রভাবিত করে। ফলে, মুল চরিত্রের সাথে আশপাশের নানান চরিত্র এসে যুক্ত হয়। তারাও তাদের জীবনের নানা কথা বলে। মোহাম্মদ হোসেনের নিজের জীবনও তাদের বাইরে নয়। এদের সাথে কাজ করতে গিয়ে এমন সব মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছি, যা আমাদের ভাবনা বা অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বারবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মানবেতরভাবে কাটানো জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। যা আমরা শুনে এসেছি পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে। কিভাবে মানুষ মাইলের পর মাইল পেরিয়ে ছুটেছে নিরপাদ আশ্রয়ের জন্য। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অনতিকাল স্মরণে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আর সেই জাদুঘরের সহযোগিতা নিয়ে আমি আরেকটি জনগোষ্ঠীর নিপীড়ন আর নির্বাসিত জীবনের গল্প ধারণ করে চলেছি।

সম্পাদনা পর্যায়ে আসতে আসতে করোনা মহামারির প্রকোপ বেড়ে গেল। এরমধ্যে আমি নিজে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলাম। তবুও একপ্রকার ঘোরের মধ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হলাম। আমি এই তথ্যচিত্রের জন্য আমার সহপরিচালক সুজন ভট্টাচার্য, ক্যামেরা সহকারী যারা ছিলেন, কারিগরি অংশে যারা ছিলেন- তাদের ধন্যবাদ জানাই। আর এই প্রজেক্টের শুরু থেকে যেসকল মেন্টর পরামর্শ দিয়েছেন - ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিক্ষক নীলোৎপল মজুমদার, নির্মাতা সৌরভ সারেঙ্গী এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকার এন, রাশেদ চৌধুরী'কে অশেষ কৃতজ্ঞতা। ঢাকা ডকল্যাব এর নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু আর তারেক আহমেদের অনুপ্রেরণা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ট্রাস্টি মফিদুল হক ভাইকে - এমন একটি তথ্যচিত্রের প্রযোজনাসহ সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ভালোবাসা । অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে গত ২৭ আগস্ট, ২০২০ 'এ মেন্ডোলিন ইন এক্সাইল' তথ্যচিত্রের আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হয় অনলাইনে। মোহাম্মদ হোসেন এই জনপদে আশাবাদের প্রতীক। সে স্বপ্ন দেখে, একদিন ফিরে যাবে তার নিজের স্বদেশে। হুকুমতের (বাংলাদেশ সরকারের) দেয়া বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীতে সে উৎসাহ নিয়ে গাছ লাগায়। সে বলে, এই গাছ গুলো বড় হলে এই বিস্তীর্ণ পাহাড়ে তাদের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। তারা চলে যাবার পর মানুষে এই গাছ দেখে মনে রাখবে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবনের কথা। সে গান গেয়ে চলে ধূসর - বিষাদময় এই ক্যাম্পের শুকনো মেঠো পথে - তার কণ্ঠে আরাকানে ফিরে যাবার তীব্র বাসনা, তার মেন্ডোলিনের সুরে জন্মভূমির জন্য বিষণ্ন বিলাপ। শেষ পর্যন্ত আমরা থেকে যাই ক্যামেরার অন্য প্রান্তে - হোসেন ও তার নির্বাসিত মেন্ডোলিনের ছড়িয়ে পড়া মূর্ছনার অদৃশ্য সাক্ষী হয়ে।

রফিকুল আনোয়ার রাসেল

শ্রাবণের পঙক্তিমালা

‘ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের উপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ যার নামের উপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।’

ধন্য সেই পুরুষ– আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, টুঙ্গীপাড়ার গ্রামের খোকা একদিন বঙ্গবন্ধু হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আশৈশব নেতৃত্বের গুণ, মানুষের প্রতি অক্ষয় ভালবাসা, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের নেতা। ব্যক্তিত্বের ঋজুতা আর দৃঢ়তার কারণে যাকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেন বিশ্বনেতারা। ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বাঙালির স্বাধীনতার সেই মহানায়ককে সপরিবার হত্যা করে স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা। জাতির জীবনে কলঙ্কময় দিন– জাতীয় শোক দিবস ১৫ই আগস্ট। ১৯৭৫ এর এইদিন ঘাতকরা শুধু স্বাধী-নতার মহানায়ককেই হত্যা করে নি, হত্যা করতে চেয়েছিল সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকেই। ঘাতকের বুলেটে জাতির পিতাকে সপরিবার হারানোর এই মাসে শোক-শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতাসহ ১৫ই আগস্টের সব শহীদকে স্মরণ করে জাতি । জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ-মুজিব বর্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বছরব্যাপি আয়েজনের পরিকল্পনা বৈশ্বিক মহামারীর কারনে প্রাথমিকভাবে কিছুটা থমকে যায়। ভাবনার উদ্রেক হয় কিভাবে মুজিববর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে। খুব দ্রুতই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভিন্ন আঙ্গিকে এই উদযাপন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর । তারই অংশ হিসেবে শোকের মাস আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সেদিনের সকল শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় ২৮ আগষ্ট রাত ৮ টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার দীর্ঘদিনের সুহৃদ বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সহযোগিতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আয়োজন করে আবৃত্তি অনুষ্ঠান ‘শ্রাবণের পঙক্তিমালা’।

আয়োজনে জাতির পিতাসহ ১৫ আগস্টে শহিদ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আহ্‌কাম উল্লাহ্।

এ আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত কবিতার আবৃত্তিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী গোলাম সারোয়ার, লায়লা আফরোজ, বেলায়েত হোসেন, রেজীনা ওয়ালী লীনা, মাসুদুজ্জামান, মীর মাসরুর জামান রনি ও সুবিদিতা চন্দ সোনালী। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ থেকে পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী রফিকুল ইসলাম, এনা-মুল হক বাবু, তামান্না সারোয়ার নীপা ও সাবিরা মাহবুব জনি। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন আবৃত্তিশিল্পী ইকবাল খোরশেদ, আহ্‌সান উল্লাহ্ তমাল ও সুপ্রভা সেবতী। অনুষ্ঠানটি গ্রন্থনায় ছিলেন মীর মাসরুর জামান রনি।

রফিকুল ইসলাম

জোরপূর্বক শ্রমের চিহ্ন অনুসন্ধান: আন্তর্জাতিক ডিজিটাল স্টাডি ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা

সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় নাজি জোরপূর্বক শ্রম ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ঘধুর ঋড়ৎপবফ খধনড়ৎ উড়পঁসবহঃধঃরড়হ ঈবহঃৎব), ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ মিটিং সেন্টার, বিশ্বব্যাপী ১৫ জন যুব-অংশগ্রহণকারী নিয়ে ১৭-২৮ আগস্ট প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ডিজিটাল স্টাডি ক্যাম্পের আয়োজন করে। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ, তুরস্ক, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, সার্বিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন এবং মেক্সিকোর প্রতিনিধি ক্যাম্পে অংশ নেয়। ক্যাম্প চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা বিশ্ব জুড়ে বাধ্যতামূলক শ্রম বিষয়ে ডিজিটাল ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী তৈরির সুযোগ পেয়েছিল।

নাজি জোরপূর্বক শ্রমের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা, শ্রম ডকুমেন্টেশন সেন্টার প্রবর্তন, ডিজিটাল এনার্জিইজার ব্যবহার করে কৌতূহলোদ্দীপক সেশনগুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ফটোগ্রাফি প্রকল্পের সাথে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী করে তোলে। একই সাথে ফটোগ্রাফির প্রাথমিক পাঠ দেয়া যাতে বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি ক্যামেরার মাধ্যমে দৃশ্যত উপস্থাপন করতে পারে। ইতিহাসের প্রতিনিধিত্বকারী ফটোগ্রাফগুলির আসল অর্থ কীভাবে

পড়া বা ব্যাখ্যা করা যায় সে সম্পর্কেও সেশনগুলিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। আয়োজকরা অংশগ্রহণকারীদের অধ্যয়ন শিবির জুড়ে সামাজিক মিডিয়া (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম) সামগ্রী তৈরি করতে দেয়।

অন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবক তাবাসুম ইসলাম তামান্না বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত হন। তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করছেন। তার প্রকল্প ‘বিধ্বস্ত স্বপ্ন’ (ঝযধঃঃবৎবফ উৎবধসং) শিশুশ্রমকে জোরপূর্বক শ্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শিশুশ্রম শিশুদের স্বপ্ন এবং শৈশব ধ্বংস করে জীবনকে পঙ্গু করে। তার ফটোগ্রাফিতে তিনি খেলনা, গাড়ি, বল, বোর্ড ইত্যাদির মতো কিছু প্রপ ব্যবহার করেছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি বিধ্বস্ত শৈশবকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। অন্য কিছু ছবিতে তিনি সেই শিশুদের পড়াশুনার আগ্রহ নিয়ে ছবি তোলেন। গত দশ বছরে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলি বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করে। শিক্ষার প্রতি প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রের কারণে শ্রম করতে বাধ্য এমন শিশুদের জীবনে বিড়ম্বনাটি নিহিত। তিনি এই ধারাবাহিকটির নাম রেখেছিলেন ‘বিধ্বস্ত স্বপ্ন’।

অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রকল্প ছিল সৃজনশীল এবং ভিন্ন। সকল ফটোগ্রাফি প্রকল্প বাধ্যতামূলক শ্রমের অতীত ও বর্তমানের চিত্র তুলে ধরে একত্রিত হয়েছে। সবাই একমত হয়েছে, ভবিষ্যতে বিশ্বের কোনও প্রান্তে কোনও ধরনের জোরপূর্বক শ্রমের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। প্রদর্শনীটি খুব শীঘ্রই সংগঠকদের ওয়েবসাইটে শেয়ার করা হবে।

নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ উদ্যোগ

বঙ্গবন্ধুর পদচ্ছাপ

দূর-দূরান্তের জনপদে বঙ্গবন্ধুর আগমন ও আলোড়নের তথ্যভাণ্ডার

১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে কৃষ্ণনগর আব্দুল জব্বার উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে-থাকা নেটওয়ার্ক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনেক কাজ পরিচালনা করছে, আরো অনেক কাজ উভয়ে মিলে সম্পন্ন করার রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরতে 'বঙ্গবন্ধুর দিন ও পঞ্জি' প্রণয়নের গবেষণা-মূলক কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই কাজে তথ্যসংগ্রহ বহুলাংশে সম্পন্ন হয়েছে, তারপরও মনে হয়েছে অনেক জানা-বোঝা বাকি রয়ে যাচ্ছে। সেই উপলব্ধি থেকে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের এই ঘাটতি পূরণে মূল্যবান তথ্যের যোগান দিতে যুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে মুক্তির স্বপ্নে উদ্বেলিত ও সংগঠিত করতে কতভাবে কত জায়গায় গেছেন, মানুষের সাথে মিলিত হয়েছেন, সভা-সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরপরই ছাত্রলীগ গঠনে শুরু হয় তার সাংগঠনিক পরিক্রমণ। এর কিছু পরিচয় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে রয়েছে। আওয়ামী লীগ গঠনের সময় তিনি ছিলেন কারাবন্দি, মুক্তির পর যখনই বাইরে থেকেছেন অক্লান্তভাবে করেছেন স্বদেশ-পরিক্রমণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় নিশ্চিত করতে প্রচার অভিযানে তিনি গেছেন দেশের বহু প্রান্তে। এরপর ১৯৬৪ সালে ফাতেমা জিন্নাকে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী করে নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি ব্যাপকভাবে সফর করেছেন। আর ১৯৭০-এর নির্বাচনে তার পথ-পরিক্রমণ ছিল যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি দূর-বিস্তারী। এছাড়াও নানা সূত্রে গেছেন নানা জায়গায়।

১৯৭০-এর নির্বাচন প্রচারণার জন্য জৈন্তাপুর রাজবাড়ির সামনে এই প্রাচিন পাথরের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন।

ছবি : অধ্যাপক মনোজ কুমার সেন

কোন্ অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু কতবার গিয়েছিলেন, কী করেছেন সেই সফরে, কোথায় বক্তৃতা দিয়েছেন, কার সাথে দেখা করেছেন, কেউ কি আছে সেই সফরের প্রত্যক্ষদর্শী, বহন করছে কোন্ স্মৃতি, আছে কি কোনো আলোকচিত্র ইত্যাদি নানা তথ্য জানতে আগ্রহী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। উপরোক্ত লক্ষ্য থেকে আমরা বিগত ২৫ জুলাই, ২০২০ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের কাছে স্ব-স্ব এলাকায় বঙ্গবন্ধুর আগমন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলাম। এই আহ্বানে দ্রুতই অনেক জায়গা থেকে অনেক ধরনের সাড়া মেলে। আগস্ট ২০২০ সংখ্যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা (প্রকাশ তারিখ : ১৫ আগস্ট) আমরা তথ্য প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ছেপেছিলাম। পিরোজপুরের এস. বি. সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে মৌলভীবাজারের হাফিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় অবধি একুশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম সেই তালিকায় স্থান পেয়েছিল। আনন্দের বিষয় যে, এই তথ্য আসা অব্যাহত রয়েছে। সেই সময় ৩০ আগস্টের মধ্যে তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে আরো অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য আমরা পেয়েছি। তথ্য-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা এখানে পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হলো।

আমরা জানি পুরনো ইতিহাসের তথ্য তুলে আনা সহজ কাজ নয়। তদুপরি আমরা আনুষ্ঠানিক সংবাদভাষ্য বা বক্তৃতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ জানতে চাই নি, চেয়েছি লোকস্মৃতিতে বঙ্গবন্ধুর আগমন ও অবস্থানের যে ছাপ রয়ে গেছে তার পরিচয়। সেই সাথে বাস্তব তথ্য, কি তিনি করেছিলেন তাঁর অবস্থানকালে, কোথায় ছিলেন, কোন্ মাঠে বক্তৃতা দিয়েছেন, কারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জানি এমন বিশদ তথ্য আহরণের কাজ সহজ নয়। তারপরও যে সাড়া আমরা পেয়েছি সেটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। আর তাই সামগ্রিক বিবেচনা থেকে বঙ্গবন্ধুর পদচ্ছাপ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। আশা করি সবার উদ্যোগে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

দৈনিক আজাদী

রাঙ্গামাটির জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

দেশে সকলেরই সমানাধিকার রয়েছে

বঙ্গবন্ধুর রাঙামাটি জেলায় সফরের সংবাদ দৈনিক আজাদী পত্রিকায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ প্রকাশিত হয়। রাঙামাটি সরকারি বারক উচ্চ বিদ্যালয় রাঙামাটি

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত কুলাউড়া ডাক বাংলো, মৌলভীবাজার

ছবি : মাজহারুল ইসলাম রুবেল

আব্দুর রহমান সেরনিয়াাদ এর বাড়ি। বরিশালে এই বাড়িতে বঙ্গবন্ধু বহুবার অবস্থান করেছেন

ছবি : সুশান্ত ঘোষ

বঙ্গবন্ধুর পদছাপ তথ্য প্রেরিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা পূর্ববর্তী সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এখানে যুক্ত হলো পরবর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম:

১. ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
২. পৌর কল্যাণ মিউনিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী
৩. পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়
৪. নিজ মেহার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শাহরাস্তি, চাঁদপুর
৫. মেহার ডিগ্রী কলেজ, শাহরাস্তি, চাঁদপুর
৬. রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি
৭. রাঙ্গামাটি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি
৮. সৈয়দা হুছেনা আফজাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৯. অধ্যাপক মনোজ কুমার সেন (অবসর), জৈন্তাপুর, সিলেট (সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা)
১০. নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর
১১. মাটিঢালী উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া
১২. রামু সরকারি কলেজ, রামু, কক্সবাজার
১৩. উলিপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১৪. উজিরপুর আলহাজ্ব বি এন ডিগ্রী কলেজ, উজিরপুর, বরিশাল
১৫. দিনাজপুর সংগীত কলেজ, দিনাজপুর
১৬. সাটুরিয়া এম এম উচ্চ বিদ্যালয়, রাজাপুর, ঝালকাঠি
১৭. কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়, উখিয়া, কক্সবাজার
১৮. হাজী মফিজ আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্বনাথ, সিলেট
১৯. সুখাতি উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২০. গৌরনদী কলেজ, গৌরনদী, বরিশাল
২১. লংলা আধুনিক ডিগ্রী কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
২২. রাজশাহী ভোলানাথ বি বি হিন্দু একাডেমী, রাজশাহী

বলাকা টেইলার্স এবং কক্সবাজারের জনসভায় পতাকা

কোভিড ১৯ এর কারণে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অচল হয়ে পরে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম। জাদুঘরও বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ। এ সময়ে কর্মসূচিভূক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সাথে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে স্মৃতিতে ভেসে উঠে নানা অঞ্চলের চাঁপা পরে থাকা মুক্তিযুদ্ধে নানা মানুষের বীরত্বের কথা। আজ খুব মনে পড়ছে লালমনিরহাট জেলার নাদু ভাই এবং কক্সবাজার জেলার মনসুর ভাইয়ের কথা। একজন মহকুমা শহরে পতাকা সেলাই করেছিলেন আরেকজন মহকুমা শহরের জনসভায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

মো. শামসুল আলম নাদু লালমনিরহাট জেলায় প্রথম তৈরি করেছিলেন স্বাধীন বাংলার পতাকা। উত্তাল মার্চের ৮ তারিখ দুপুর ১২টার দিকে দোকানে কাজে ব্যস্ত ছিলেন এ সময় ছাত্র নেতা শহীদুল্লাহ, বজলুর রশীদ পিন্টু, কুদরতে খোদা, লাভলু গার্ড, ফারুক হোসেন ও নাছিম উদ্দিনসহ আরো অনেকে এসে বললেন আপনার হাতে কাজ রেখে এখন আমাদেরকে পতাকা বানিয়ে দেন। ছাত্রনেতাদের কথা শুনে প্রথম কিছু ভয় পেয়ে গেল, কেননা দোকানের চার পাশ বিহারীদের বসবাস। মনের মধ্যে জোর পেলাম এবং ভাবলাম যুবকরা যদি দেশের জন্য এগিয়ে আসতে পারে তবে আমি কেন ভয় পাব। মরলে মরব তারপরও দেশের জন্য এ কাজটি আমাকে করতে হবে। চারটি পতাকা সেলাই করতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লেগে যায় এ সময় কিছু ছেলে রাস্তার ধারে পাহাড়া দেয় আর কিছু ছেলে দোকানের ভিতরে বসা ছিল। চারটি পতাকা সেলাই করা হয়েছিল সিও অফিস, বেঙ্গল থানা, শহীদ মিনার ও জি আর পি থানায় টাঙানোর জন্য। মো. সামসুল আলম নাদুর বাড়ী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চন্ডিতলা গ্রামে ১৯৬৭ সালে জীবিকার সন্ধানে লালমনিরহাট থানায় চলে আসেন এবং ১৯৬৯ সালে লালমনিরহাট শহরের গোশালা রোডে বলাকা টেইলারিং প্রতিষ্ঠান চালু করেন যা কিনা লালমনিরহাট শহরের প্রথম পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিবন্ধি মো.সামসুল আলম নাদুভাই শারীরিক অসমর্থতার কারণে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও তার নিজ অবস্থান থেকে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। জীবনের ঝুকি নিয়ে দেশের জন্য স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরী করেন লালমনিরহাট জেলায়। এই পতাকা তৈরীর কারণে বিহারীদের রোষানলে পড়ে তাঁকে হারাতে হয় দোকানের সেলাই মেশিন সহ অনান্য মালামাল। ভারতে পালিয়ে যেতে হয় জীবন বাঁচানের জন্য। দেশ স্বাধীন হলে লালমনিরহাটের মায়ায় আবারও ফিরে আসে এবং নতুন করে শুরু করে বেঁচে থাকার লড়াই। পুনরায় আবার শুরু করেন বলাকা টেইর্লাস তবে নতুন জায়গায় ষ্টেশন রোডে '৭১ এ সেই বলাকা টেইর্লাস। 'বলাকা টেইলার্স' মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রতীক।

এ কে এম মনসুরুল হক কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানের জনসভায় ৩ মার্চ ১৯৭১ বিকাল তিনটায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ জনসভা সমর্থনে সকাল দশটায় শহরে মিছিল বের হয় মিছিলটি এস ডি ও অফিসের সামনে আসতেই হঠাৎ ছাত্রনেতা আল মামুন শামশুল হুদা (মান্নু) তালাবদ্ধ এস ডি ও অফিসের পাইপ বেয়ে তিন তলার উপরে উঠে সেখানে টাঙানো পাকিস্তানী পতাকাটি নামিয়ে ফেলে। দুপুর বারোটা নাগাদ মিছিল শেষ হলে তরুণ মনসুর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় বাজারে ইব্রাহীম খলিফার দোকানে গিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা বানানোর কথা বললে ইব্রাহীম খলিফা আঁতকে উঠেন, কিন্তু মনসুর ভাইয়ের জিদে পতাকা বানিয়ে দিতে হল। তারপর মনসুর পতাকাটিকে কোমরে পেঁচিয়ে পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে পূর্ব নির্ধারিত জনসভা মঞ্চের সামনে এসে বসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনসভাস্থলে ছাত্রনেতারা উপস্থিত হলে মসনুর ভাই সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বলে উঠেন- "ঢাহাত হালিয়া স্বাধীন বাংলার পতাকা তুইল-লে আজিয়া আঁয়ারা এড়ে এই জনসভাত স্বাধীন বাংলার পতাকা তুইল-লম"। এমন সময় এস ডি ও অফিস থেকে নামানো সেই পতাকাটি (পেট্রোল দিয়ে ভেজানো) সুনিল দে (ফুটবলার) গোপনে মনসুরের হাতে দিলে পতাকাটি নিয়ে এক দৌড়ে উঠে গেলেন জনসভা মঞ্চে। ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী বাশেঁর লম্বা কাঁঠি এনে দিলে মনসুর সেই কাঠির ডগায় পেট্রোল মাখানো পাকিস্তানী পতাকাটি ঝুলিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। বীর ছাত্র জনতা 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত করে তুলল পাবলিক লাইব্রেরী ময়দান। তৎক্ষণাৎ মনসুর বাঁশের ডগায় বাঁধা পোড়া পাকিস্তানী পতাকাটি ছিড়ে স্বাধীন বাংলার পতাকাটি বেধে জনসভা মঞ্চের পাশে উত্তোলন করে শ্লোগান দিলেন 'জয় বাংলা'। ১৯৭১এর পতাকা উত্তোলনের নায়ক এ কে এম মনসুর ভাইয়ের এই কথা সহবন্ধু ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনা। একদিন হারিয়ে যাবে মনসুর ভাই কিন্তু মনসুর ভাইয়ের ভূমিকার কথা কি জানতে পারবে এ প্রজন্ম ?

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে

অনলাইন শিক্ষক-সম্মিলনী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের এক বড় দিক ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভাগীয় পর্যায়ে দিনব্যাপী সম্মিলনী, যা ঢাকা অথবা ঢাকার বাইরে আয়োজিত হয়। এই সম্মেলন সবার জন্য এক আনন্দ আয়োজন, সেইসাথে নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে নতুন কাজে ঝাঁপ দেয়ার সুযোগও বটে। তবে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে এমন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আমরা করতে পারছি না, এটা সবার বোধগম্য। তবুও তো আমরা ভুলি না আমাদের অঙ্গীকার, সচেষ্ট হই দুর্যোগকে সুযোগ করে তুলতে। আর তাই নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎসাহ সমর্থন পেয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো অনলাইনে শিক্ষক সম্মিলনী আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ দিনব্যাপী এই সম্মিলনে যোগ দেবেন কুমিল্লা, বগুড়া, ফেনী ও গাইবান্ধার নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান-প্রধানবৃন্দ। চার জেলা মিলিয়ে প্রায় শতাধিক শিক্ষক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ আমরা প্রত্যাশা করছি।

যেহেতু অনলাইনে আয়োজিত হবে এই সম্মেলন এবং অনেক বেশি প্রতিনিধির বক্তব্য শোনার সুযোগ এখানে করা যায়, সেই লক্ষ্যে দিনব্যাপী অধিবেশন আমরা দুভাগে বিভক্ত করে নিয়েছি। সকালের অধিবেশনে দুটি জেলা এবং বিকেলের অধিবেশনে দুটি জেলা পৃথকভাবে যোগ দিবে। তাতে করে সম্মেলন অনেক বেশি অংশীদারিত্বমূলক করা যাবে বলে আমরা মনে করি। সম্মেলনের আলোচনায় নতুন পরিস্থিতিতে জাদুঘরের নিয়মিত শিক্ষামূলক কার্যক্রম কীভাবে অব্যাহত রাখা যায় এবং নতুনভাবে সূচিত কাজ বাস্তবায়ন ও বেগবান করা যায় সে-বিষয়ে সবার সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনেক প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষক সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে আছে। আশা করা যায় দূর-দূরান্তের শিক্ষক প্রতিনিধির অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরামর্শ নতুন চিন্তা ও নতুন পথ উন্মুক্ত করবে এবং আমাদের যৌথ কাজ জোরদার করে তুলবে। সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সকল নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের অবহিত করা হবে। অনলাইন শিক্ষক সম্মেলন সফল হলে নিয়মিত ব্যবধানে এমনি সম্মিলনীর আয়োজন করে জাদুঘর ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক বন্ধন আরো জোরালো করে তোলা যাবে।

২৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমারে দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেত পুতুল বিশেষ ব্যবস্থঅপনায় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন–

Thank you for this amazing trip into the history of the Bangalee people. It makes me proud to call myself a Bangladeshi

Regards
Saima Wazed

শিক্ষক সম্মিলনে শুরু হল নতুনধারা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, জাদুঘরের বৃহত্তর পরিবারে কর্মসূচিভুক্ত নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাদের সাথে জাদুঘরের সম্পর্ক এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণত এই রকম গভীর মানবিক সম্পর্ক সচরাচর গড়ে ওঠে না। এটা জাদুঘরের আন্তঃশক্তির সবচেয়ে বড় দিক। করোনাকালে এই শিক্ষকদের সাথে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক সূচিত হয়েছে মূলত 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র মাধ্যমে।

প্রথম থেকেই কর্মসূচিভুক্ত নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দ নিয়ে আমাদের সম্মিলনের আয়োজন ছিল যেখানে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রমকে আরও উন্নত করার উপায় শনাক্ত করতে পেরেছি। এর আগে ৩৩টি সম্মিলন আমরা সরাসরি করতে সক্ষত হয়েছি কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই আয়োজনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। অনলাইনে মোবাইল বা ল্যাপটপে জুম অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানে থেকে সম্মিলন নতুন অভিজ্ঞতা। আমাদের এই অন-লাইন সম্মিলনে অভ্যস্ততার বিকল্প নেই মনে হয়। কারণ বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী আমাদের যেভাবে ঘরে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে আর মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তিতে আরও দ্রুত বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে সেই বদ্ধতা থেকে। ফলে প্রযুক্তির সাহায্যে অনলাইনে সম্মিলন বাদ দেয়ার সুযোগ থাকবে না। করোনামুক্ত বিশ্ব ফিরে এলেও সম্মিলনে অনলাইনের সুবিধা আমাদের নিতে হবে বিভিন্ন কারণে। যাতায়াতের সমস্যা, সময়ের স্বল্পতা, অসুস্থতা, অর্থ খরচের হিসেব থেকে এটা মনে করা যেতে পারে যে, বিশাল আয়োজনের সকল চাওয়া এই বিকল্প সম্মিলনে পাওয়া সম্ভব। ফলে আমাদেরকে নতুন করে এর বিষয়গুলো রপ্ত করা দরকার।

একটা এনড্রয়েড মোবাইল সেট এবং তাতে জুম অ্যাপটি সাপোর্ট করলেই সম্মিলনে অংশগ্রহণ সম্ভব। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলে অনলাইনে ক্লাস করছেন। ফলে এটা আরও সহজ হবে মনে করি। কিন্তু জাদুঘরের এই সম্মিলনে শুধু সংযুক্ত হলেই হবে না, অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়ে একে সার্থক করতে হবে। এভাবেই নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং জাদুঘরের সম্পর্কের দেয়াল হবে দৃঢ়, মজবুত।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের প্রদর্শনী দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের মন্তব্য

কুমিল্লা জেলা

আজ, ০৮ই ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার, আজ এ দিনটি আমার জীবনে খুবই স্মরনীয় একটি দিন। আমি যতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো, ততদিন এ দিনটির কথা মনে থাকবে। আজকের এই আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ ভ্রাম্যমান জাদুঘর দেখে আমি খুবই আনন্দ উপভোগ করছি। যাদেও জন্য আমি এ ভ্রাম্যমান জাদুঘর দেখছি, তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই। অবশ্যই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম না, কিন্তু এই জাদুঘরের ভ্রাম্যমান দৃশ্য আমাকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক ধারণা লাভ করেছি, এই জন্য আমি খুবই গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধের এ কষ্টের দৃশ্য সম্পর্কে আমরা অনেক ধার-ণা লাভ করেছি। --- যারা আমাকে এ মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্য দেখার সুযোগ দিয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আশা করি যে, এ মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্য দেখে আ-মরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুবই অবগত হবো।

সানজিদা আক্তার
দশম শ্রেণী
ময়নামতি দারুস সুন্নাত আলিম মাদ্রাসা

আজকে যেন ১৯৭১ সালের যুদ্ধক্ষেত্রটি চোখের সামনে দেখলাম। ১৯৭১ সালের বাংলার সন্তানদের তাদের দেশের জন্য তারা কতটুকু আত্মত্যাগ করছে তা আজ এই মুক্তিযুদ্ধ ভ্রাম্যমান জাদুঘরের মাধ্যমে জানতে পারলাম। আমি আজকে প্রাচীন মাটির ফলক, চর্যাপদ, নির্যাতিত মানুষ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জিনিস দেখতে পেরেছি। ধন্যবাদ সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য। এতে আমরা আমাদের স্বাধীনতার পেছনের অনেক ঘটনা জানতে পারলাম। ধন্যবাদ

ইসরাত জাহান বৃষ্টি
একাদশ শ্রেণী
হাজী আক্রাম উদ্দীন স্কুল এন্ড কলেজ।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাস ও ভিডিওগুলো দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। এগুলো দেখে আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি। আমার স্বপ্ন ছিল একবার জাদুঘর দেখার। কিন্তু আজ সেটা পূরণ হয়েছে। পরবর্তীতে যেন জাদুঘরটি আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জাদুঘরের অনেক চমৎকার জিনিস দেখে আম-ার মনে অনুভূতি জোগালো। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল।

মোঃ সুমাইয়া আক্তার সুমী
ষষ্ঠ শ্রেণী
এ মালেক ইনিস্টিটিউট
(রেলওয়ে হাই স্কুল)

ফেনী জেলা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে আজও অজানা। তাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে আমি ১৯৪৭ - ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অনেক ইতিহাস জানতে পারি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালি ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা, বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করার যে প্রচেষ্টা তা আমরা স্বচোখে দেখতে পেয়েছি। তাছাড়া ১৯৬৬ সালের বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে জানতে পারি। সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানা অবদান আমরা দেখতে পাই। ভালোবাসা

জয়নাল আবেদীন।
মঙ্গলকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

এই যুদ্ধ আমরা দেখিনি, কিন্তু দাদা-দাদী ও অনেক পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যমে মাঝে মাঝে জানতে পেরেছি। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। আজ আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেছি। আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ই-তহাস জানানোর জন্য এই ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে শুধু একটি কথাই বলতে চাই ''জয় বাংলার জয়''। সকল শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার সালাম।

এমরান হোসেন
দশম শ্রেণী
আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।

ধন্যবাদ ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তারা আমাদের বিদ্যালয়ে এসেছে বলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরেছি, দেখেছি কিছু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি এবং দেখেছি তাদের ব্যবহৃত জিনিস , যা আ-মরা আগে দেখিনি। আমাদেও ইচ্ছা ছিল এসব জিনিস পরিদর্শন করার। কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেতে পারিনি। কিন্তু আপনারা আমাদেরকে আমাদের স্কুলে এনে সেগুলোকে প্রদর্শন করার সৌভাগ্য করে দিয়েছে। আমাদের জন্য এই দিনটি একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ভ্রাম্যমান জাদুঘরকে।

জান্নাতুল মাওয়া জিনাত
নবম শ্রেণী
কাজির দীঘির পাড় সমাজ কল্যান উচ্চ বিদ্যালয়।

বগুড়া জেলা

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী ও বাবা-মা'র কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছি। মুক্তিযুদ্ধটা কেমন ছিল, কীভাবে হয়েছিল? সেটা সম্পর্কে আমার মনে তেমন অনুভূতি ছিল না। কিন্তু আজ আমি ভ্রাম্যমান জাদুঘর দেখে আমার মনে একটা আলাদা অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। আমি নিজের স্বচক্ষে অনেক কিছু দেখতে পেরেছি। পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের উপর কীভাবে অত্যাচার, নির্যতন করেছিল, বাংলার মা-বোনদের উপর কীভাবে পাশবিক নির্যাতন করেছিল , কীভাবে তারা বাংলার মানুষদের পাখির মতো গুলি করেছিল এসব কিছু আমি জানতে পেরেছি। আরও অনেক কিছু জানতে পেরেছি । বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা তাদের সাহস ও বীরত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলা মায়ের মুক্তিকামনায়। আমি আমার দেশের জন্য গর্বিত বোধ করি সর্বশেষে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই ভ্রাম্যমান জাদুঘরকে

নুসরাত জাহান
অষ্টম শ্রেণী
লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

বগুড়া জেলা

ক্রমিক নং : ২১৩১৯

অনেক সুখেই সংসার জীবন কাটছিল তার। সেদিন ছিল ৭ই মার্চ। তারা শুনতে পেলেন যে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি সবাইকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলতে বলেছেন। তখন তিনি শিউরে উঠলেন। ২৫ মার্চ রাতে যখন ঢাকায় নিরীহ বাঙালি হত্যা শুরু করা হয়। তারপর থেকে দীদা খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি কোথায় যাবেন, কি করবেন। এর এক মাস পরে গ্রামে হইহট্টগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই ছোটাছুটি করছে দীদাও বাড়ি থেকে তার ছোট্ট বাচ্চা ও স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দেখল রাজাকারেরা মানুষের ঘরে ঢুকে সব জিনিস বাইরে ছুঁড়ে ফেলছে। পুরুষদের গুলি করে মারছে। আর মা বোনদের সম্মান নষ্ট করে তাদের সব কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন রাত ১০.৩০ মিনিট। আবার দীদা বাড়ি ফিরলেন আর দেখলেন তার ঘরের বিছানা ছাড়া আর কিছুই নেই। রান্না করা খাবারটুকুও বাকি রাখেনি। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন তারা ভারতে চলে যাবেন। দুই দিন পর তারা প্রস্তুত ভারতে যাওয়ার জন্য। এমন সময়ে মিলিটারিরা এলো বলে সবাই প্রাণের ভয়ে দৌড়াচ্ছে কিন্তু ঐ গ্রামের কিছু লোক আগেই গ্রামের ভেতরে ঢোকার রাস্তা কেটে দিয়েছিলেন। তখন মিলিটারিরা গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের অন্য গ্রামের দিকে রওয়ানা হলেন। কিছুক্ষণ পর পাশের গ্রাম থেকে রাশি রাশি ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকল। মেয়েদের

আর্তনাদ ও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যখন মিলিটারিরা সেই গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিল তখনই দীদারা বেরিয়ে পড়ে ভারতে যাওয়ার উদ্দেশে। তারা রাতে পথ পাড়ি দিত। সকাল বেলায় কোথাও না কোথাও লুকিয়ে পড়ত। একদিন বিকেলে তারা পথ হাঁটছিল তারা খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল অবিরাম গতিতে তারা এক মাস হেঁটেছে। তখন তারা অনেক মর্মাহত চিত্র চোখের সামনে ঘটতে দেখেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারেনি। তিনি দেখলেন লাশের স্তূপ সেখানে একটি বাচ্চা মরা মায়ের দুধ খাচ্ছে। আবার একটি নারীর ইজ্জত নষ্ট করে তার চুল কেটে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে দুই হাতের তালুতে পেরেক মেরে রেখে দিয়েছে। মেয়েটি জীবন্ত ছিল। অনেক নারীকে উলঙ্গ ও জীবন্ত অবস্থায় পা গাছের সাথে বেঁধে মাথা নীচের দিক করে ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু দীদা ও দাদু প্রাণের তাগিদে ছুটছিলেন। সন্ধ্যার দিকে তারা একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তখন সেখানে আরেকটি মহিলা এসে আশ্রয় নিলেন। তিনি আর কেউ নন আমার দীদার বড় বোন। দুজনার দেখা হওয়াতে তারা কেঁদে ফেললেন। তিনিও ভারতে যাবেন কিন্তু বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তিনি তার সব স্বজনদের হারিয়েছেন। যখন তারা বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলেন তখন তার ভাইপো তার ভাইকে বললেন সোনার থলিটা নিয়ে আসতে এবং তখনই তারা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তার ভাই বাড়ি থেকে সোনার থলিটি নিয়ে বের হওয়ামাত্র পাকিস্তানী বাহিনী এসে গুলি করে দেয়। সেখানেই পড়ে যান তিনি। তিনি শেষ অবস্থায় এসে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে একটু জল চেয়েছিলেন। তখন এক পাকিস্তানী সৈন্য নারকেলের মালায় প্রস্রাব করে মুখের ওপর ঢেলে দেয় এবং তিনি মারা যান। পাকিস্তানী বাহিনীর হাসির আওয়াজে আকাশ-বাতাস কম্পিত হচ্ছিল। তখন দীদার বড় বোনের ছোট ছেলেটি ভয়ে চিৎকার করতে চাইলে তার মুখ ঠেসে ধরা হয় এবং তার সন্তান মারা যায়। দুই বোন তাদের দুঃখের কথা বলতে বলতে যখন দেখলো সকাল হয়ে গেছে তখন তারা দেখল আর বেশি দেরি নেই ভারত পৌঁছতে। তারা হেঁটে ভারতে পৌঁছলেন। এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে এসেছিলেন।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
দিপা মনি দাস (প্রিয়া) আদমদীঘি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল নং ০৩ ঠিকানা: আদমদীঘি, বগুড়া	**জমিনি রায়** ঠিকানা: ছোটকণ্ঠি, কুমিড়া পণ্ডিতপুকুর, নন্দীগ্রাম, বগুড়া বয়স: ৬৫, সম্পর্ক : দীদা

ফেনী জেলা

ক্রমিক নং : ২২১৮৪

দিনটি ছিল শনিবার। মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য একত্রিত হয়ে ক্যাম্পে যাচ্ছে। তাদের ক্যাম্পটি ছিলো আহাম্মদ গ্রামে, নৌকা বেয়ে নদী দিয়ে ঐ গ্রামে যাওয়া হয়। মুক্তিবাহিনী ভোর পাঁচটার দিকে রওয়ানা দেয়। যেতে যেতে হিজলতলা গ্রাম পার হলো। তখন বেলা ৪.৩০ মিনিট বাজে। হঠাৎ করে পাকিস্তানি বাহিনী ৫টি নৌকা নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল এবং ধরে নিয়ে গেল। প্রথমে জগৎপুর গ্রামে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। পরে তাদের হাজিগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা সর্বমোট ২০ জন ছিল। সেখানে তাদের পাকিস্তানি বাহিনী নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল। কারো হাতের আঙুল কেটে দিয়েছিল, কারো পায়ের নোখ উপড়ে ফেলেছিল। কারো হাত পা ভেঙে দিয়েছিল। এত অত্যাচারের পর সারা রাত দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে উপরের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। পরের দিন রবিবারের কথা পাকবাহিনী সকাল ৬টা বাজে এসে সকলকে বাঁধা অবস্থায় চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিল। এরপর দুপুর ১২টায় ৭টি নৌকা নিয়ে তাদেরকে সোহাগপুর গ্রামে নিয়ে আসে। সেখানে আরও দুই দিন রাখে তাদের এবং বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতে থাকে। বুধবার বিকাল ৫টা বাজে ১০ জন পাকবাহিনী তাদের বেঁধে কাটাখালি গ্রামে নিয়ে যায়। কাটাখালি ব্রিজের পাশে তাদের দুইজন করে ১০টি জুটি বাঁধে। এক এক করে নয় টি জুটিকে বসিয়ে গুলি করল। এমনভাবে বসিয়েছিল যাতে করে গুলি করার সাথে সাথে পানিতে পড়ে যায়। গুলি করার পর নয় টি জুটির সব কয়টিকে পানিতে ফেলে দিল। শেষ একটি জুটিতে ছিলো দুলাল, মোস্তফা ও তমিজ উদ্দিন। এই দুইজনের মধ্যে দুলাল মোস্তফাকে বসাতে না পারায় তার বুকে গুলি করে। দুই জন বাঁধা থাকায় তমিজ উদ্দিনও পানিতে পড়ে মারা যায় এবং পানিতে একটি শক্ত জিনিসের সাথে টান লেগে তার বাঁধনটি খুলে যায়। পাকিস্তানীরা গুলি করার চেষ্টা করে। সন্ধ্যাবেলা হওয়ার কারণে তার গায়ে গুলি লাগেনি। ফলে তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। সেখান থেকে তিনি সোজা সূর্যদি গ্রামে চলে যান। তিনি শুনেন যে সেখানে ৬৫ জনকে গণহত্যা ও ৩০০টি ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর আরো জানেন যে সোহাগপুর গ্রামে বেছে বেছে ১৮৭ জনকে মেরে ফেলেছে। এবং তার নিজ গ্রাম জামালগঞ্জেও ১৪২ জনকে গণহত্যা করে। এসব ঘটনা শুনে তিনি পুনরায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আরাফাত রহমান বক্স মাহমুদ উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম শ্রেণী, ক শাখা, রোল নং : ০৩	**মো: ইউনুছ মিয়া** ঠিকানা : পরশুরাম, ফেনী বয়স : ৭০, সম্পর্ক : দাদা

গাইবান্ধা জেলা

ক্রমিক নং- ৩০৩০৪

আমার বাবার মুখ থেকে শোনা। ১৯৭১ সালের কথা, অক্টোবর ১৯৭১ এর প্রথম দিকে। সম্ভবত বাবা তখন ২য় শ্রেণীতে পড়ালেখা করেন। বাবার মেঝো ভাই সামছুল আলম, বড় ভাই মো. আ. হালিম মিয়া, তৃতীয় ভাই আ. হামিদ, সেজো বোন আফি-পয়া ও সব ছোট বোন রেহেনা, আমার দাদি এবং বাবা শহীদুজ্জামান শহীদ উক্ত পরিবারের সদস্য। জমি-জমা, গরু-বাছুর, বাজার-হাট করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক ছিল মো. ফজিল হক। আমার দাদি, সকালে সবাইকে রুটি অথবা পান্তা খেতে দিত এবং দুপুরের শেষের দিকে ভাত খেতে দিত, রাতে খাবার দিত না। অনেক্ষণ জেগে থাকার পর বাবা, ফুফু, বড় আব্বু সবাই শুয়ে যেত।

আমার বাবার এক শ্রদ্ধেয় চাচা ছিল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজ উদ্দিন আহমেদ। বাবার সেজো ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের নাম উড়িয়া ইউ-নিয়ন (উত্তর)। সেদিন আনুমানিক রাত বারটা হবে। হঠাৎ করে জানালার কাছে এসে ডাকছে মা মা দরজা খোল, মা আমি সামছুল আলম, মা উঠ মা, ডাক শুনে দরজা খুলল এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠে এবং ভাইয়ের বুক ও পিঠ ধরে বুকে চেপে ধরল, দাদি বলল, বাবা কীভাবে এখানে আসলি, বাবা তুই তাড়াতাড়ি চলে যা, মিলিটারিরা তোকে মেরে ফেলবে। দাদির কান্নাকাটি শুনে আব্বু, ফুফুরা জেগে উঠল এবং দাদির অনুনয়, বিনয় দেখে আব্বু, ফুফুরাও কাঁদতে লাগল। দেখল, তার

ভাইয়ের পরনে আন্ডারওয়ার খালি গা, শরীর পানিতে ভেজা। চোখ, মুখে মৃত্যুর ভয়। বড় আব্বু বলে, মা শুধু ছোট ভাই বোন আর তোমাকে দেখতে আসছি মা। জানিনা এরপর দেখব কিনা।

এই কথা বলে, আব্বুসহ সবার মাথায় হাত বুলিয়ে কেঁদে কেঁদে বড় আব্বু ছটফট করে চলে গেল। শুধু বলে, মা চাচা আমাদের সাথেই থাকেন। চিন্তা করবেন না। আমরা বকসীগঞ্জের গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী ক্যাম্পে থাকি।

আমার বড় আব্বু চলে গেল। কান্নাকাটি করে কোনমতে রাত শেষ হয়ে গেল। সকালে দাদি সবাইকে নিয়ে নাস্তা খেতে দিচ্ছে হঠাৎ করে গুলির আওয়াজ চো চো করে আকাশে শোনা যাচ্ছিল। দাদি সবাইকে নিয়ে হাত ধরে তড়িৎ গতিতে নদীর পাড়ের নিচে সবাইকে মাথা নিচু করে থাকতে বলল। আব্বুরা সবাই তাই করল। এভাবে দু ঘন্টা খুব কষ্টে পায়খানার গন্ধের মধ্যে ছিল। পার্শ্বের বাড়ির এক পাকিস্তানীর দালাল, আমাদের বাড়িটা এবং ঘরগুলো মিলিটারিদের দেখিয়ে দিল এবং পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে এক ঘন্টার মধ্যে আমার আব্বুদের বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেল। আমরা নাকি মুক্তিবাহিনীর ও আওয়ামী লীগের সভাপতির জনগোষ্ঠী তাই বাড়ি পুড়িয়ে দিল। এখন আব্বু ও সবাই ভাবে, আমরা এখন থাকি কোথায়? আমার আব্বু ও দাদি ফুফুরা সবাই আশ্রয়হীন। এই সংবাদে বড় ভাই আ. হালিম ছুটে এল এবং সবাইকে সাথে করে তার শ্বশুরবাড়ি, বর্তমান কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম পার্শ্বের বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে

গেল। বড় আব্বু যখন সবাইকে সাথে করে নিয়ে আসে, তখন মিলেটারি মেজরসহ কয়েকজন ফৌজ আমাদের মানে আব্বুদের হল্ড শব্দ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। বড় আব্বু এসে দাঁড়াল এবং মেজোরের সামনে উর্দু ভাষায় কি জানি বলাবলি করল। তারপর আব্বু, দাদি, ফুফু, বড় আব্বু সবাইকে চলে যেতে বলল। পাকিস্তানীদের চেহারা এত বীভৎস তা বর্ণনাহীন।

সংগ্রহকারী
মোছা. নিশাত জামান তিথী
স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৬ষ্ঠ শ্রেনী, রোল : ০১

বর্ণনাকারী
শহীদুজ্জামান শহীদ
আমার বাবা

কুমিল্লা জেলা

ক্রমিক নং -৭৪৪৩

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি ছিলাম চাঁদপুর। তখন আমার স্বামী ছিলেন ওয়াপদার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। যখন আমরা মানে আমি, আমার স্বামী ও আমার ছেলেমেয়েরা শুনলাম যে, পাকিস্তানি আর্মি চাঁদপুরের দিকে আসছে। তখন আমরা খুব ঘাবড়ে যাই। তখন আমরা ইউ-নয়ন বোর্ডের এক সদস্যের বাড়িতে রাত কাটাতাম। এ রকম করে আমরা ৪ দিন সেখানে থাকলাম। যখন শুনলাম যে তারা আমাদের কলোনি (যোল ঘর ওয়াপদা কলোনি) রেড করতে আসছে। তখন আমরা ইসুলি রেস্ট হাউজে থাকতাম। সেখানে কতোদিন ছিলাম তা ঠিক মনে নেই। কিন্তু যখন শুনলাম যে তারা এই দিকে আসছে তখন আমরা গেলাম রায়পুর রেস্ট হাউজ (রায়পুর)। যখন তারা এদিকে আসছে শুনলাম তখন আমরা রওনা হলাম নোয়াখালীর দিকে। নোয়াখালী যাবার পথে আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল আর বাইরে ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি। তখন আমরা বহু কষ্টে এক রিকশা চালকের ঘরে ১ রাত কাটালাম। তারপর আমাদের গাড়ি ঠিক করানোর পর আমরা রওনা দিলাম নোয়াখালীর দিকে।

নোয়াখালী রেস্ট হাউজে ১ রাত কাটালাম। তারপর সকাল ৯টায় রওনা দিলাম চর আমানুলার দিকে। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ২ দিন ছিলাম। তারপর অনেক কষ্টে গেলাম সন্দ্বীপ। সন্দ্বীপে নিজেদের বাড়িতে ছিলাম। যখন শুনলাম পাকিস্তান আর্মির একটি গানবোট এসেছে তখন চলে গেলাম আমাদের গ্রামের বাড়িতে। সেই রাতে তারা একজন এডভোকেট যায়েদ মোক্তারকে মারল। আরও কিছু সাধারণ মানুষকে মেরে পরদিন তারা সকাল বেলা চলে গেল চট্টগ্রাম। এভাবে চলল দু'তিন মাস। তারপর সেপ্টেম্বরের দিকে তারা আমার স্বামীকে খবর পাঠাল যে তাকে অবশ্যই তার কর্মস্থলে থাকতে হবে। পরে আমরা আবার চলে এলাম চাঁদপুর।

আমরা আমাদের আগের বাসায় ছিলাম। তখন মাঝে মধ্যেই গোলাগুলি হত তখন আমরা থাকতাম আমাদের কলোনির ভিতরে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে। এরকমভাবে চলতে থাকল। এক সময় আমরা জানতে পারলাম যে পাকিস্তান আর্মি চলে যাচ্ছে। সেদিন ছিল ১৫ ডিসেম্বর। পরদিন ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। সেদিন ১৬ ডিসেম্বর, আমরা জানতে পারলাম যে আমরা স্বাধীন। সেদিন ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকলো। তারা এসে আমাদের বাসায় ক্যাম্প করল। তখন আমরা থাকতাম আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে। তারপর সেখান থেকে চলে এলাম ঢাকায়।

আমি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক পরিস্থিতির শিকার হয়েছি যা বলা আমার পক্ষে খুব কঠিন কারণ এত মানুষ যে অনাহারে ছিল, বাসস্থান ছাড়া ছিল, ভয়ের মাঝে ছিল, যে কষ্ট, যা আমি পেয়েছিলাম সে কষ্টকর অনুভূতি উল্লেখ করা সত্যি অনেক কঠিন।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
Cadet Akib Comilla Cadet College T-1385, Class-VIII House-Titas	জাহানারা বেগম বয়স-৭০

শোকবার্তা

রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার কাউখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক সদা হাস্যোজ্জল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বাবু প্রকাশ চন্দ্র দাশ ১৯ আগস্ট ২০২০ রাত এগার-টায় চট্টগ্রামস্থ একটি ক্লিনিকে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে পরলোক গমন করেন। বাবু প্রকাশ চন্দ্র দাশের অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। পরোপোকারী সদা হাস্যোজ্জল প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র দাশ কথা দিয়েছিলেন ২০ আগস্ট ২০২০ কাউখালী ও রাঙ্গুনিয়ায় বঙ্গবন্ধুর পথ পরিক্রমার তথ্য জানাবেন, সে তথ্য পাঠাতে পারবেন না তিনি। ওপার ভুবনে আপনি ভালো থাকুন স্যার এই প্রার্থনা করি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার

নবযুগের যাত্রা

১ম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিটিং করার জন্য দু'টি অফিসিয়াল জুম অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যার একটি বজলুর রহমান স্মৃতি পদক-২০১৯ বিতরণ অনুষ্ঠান করার সময় স্বতন্ত্র জি-মেইল অ্যাকাউন্টে খোলা হয়েছে। অন্যটি সিএসজিজে-এর তত্ত্বাবধানে খোলো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ড ও ডিজিটাল সম্পৃক্ততার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হলো:

স্মারক সংগ্রহ ও প্রদর্শন : লকডাউনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীসমূহ অনলাইনে আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথমবারের মতো ৬-দফা দিবস উপলক্ষে এবারের ৭ জুনের প্রদর্শনীটি অনলাইনে আয়োজন করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত দু'টি ভিন্ন ইউটিউব পোস্টের মাধ্যমে ১,৩৩২ জন দর্শক দেখেছে।

জাদুঘরের ২য় অনলাইন প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয় হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে, যা এখন পর্যন্ত ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে ৩২০ জন দর্শক দেখেছে। জাদুঘরের ৩য় অনলাইন প্রদর্শনীটি আয়োজন হয়েছে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে, যা এখনপর্যন্ত ইউটিউব চ্যানেলে ৯৯৬ জন এবং ফেসবুকের মাধ্যমে ৩৬ হাজার ৪শ'র অধিক দর্শক দেখেছে।

অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি: লকডাউনের পর থেকে জাদুঘরের অনুষ্ঠান আয়োজনের বাস্তবতা পাল্টে গেছে। এসময় আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান অনলাইনে আয়োজিত হচ্ছে। যেমন: জাহানার ইমাম ও সুফিয়া কামাল স্মরণ অনুষ্ঠান, তাজউদ্দীন আহমেদের জন্ম দিন, বজলুর রহমান স্মৃতি পদক বিতরণের অনুষ্ঠান এবং জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানমালা এবার জুম ও ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় শোক দিবসের কবিতা আবৃত্তি আসর 'শ্রাবণের পঙক্তিমালা' অনুষ্ঠিত হয় ফেসবুক প্রিমিয়ারের মাধ্যমে, অনুষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত দেড় হাজার দর্শক দেখেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বজলুর রহমান স্মৃতি পদক বিতরণের অনুষ্ঠানটি হাইব্রিড-রিয়েলিটিতে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেখানে পদক প্রদান করা হয়েছে জাদুঘরের সেমিনার কক্ষ থেকে, কিন্তু পদক প্রাপ্ত অতিথি ব্যতীত অন্যান্য সকলে যুক্ত হয়েছেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।

গবেষণা ও প্রকাশনা: গত জুন মাস থেকে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' নবরূপে অনলাইনে প্রকাশ হচ্ছে। এটি বর্তমানে ইমেইল এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। ফেসবুক, টুইটার, লিংকিন ব্যবহার করে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র অধিক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

সিএসজিজে: ৩০ এপ্রিল ২০২০ বাংলাদেশ চ্যাপ্টার অব ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসএর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ট্রানজিশনাল জাস্টিস'ভার্চুয়াল আলোচনা। বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষে ২৯ জুন ডিজিটাল 'গ্রেড এক্সিবিট' অনলাইনে উদ্বোধন হয়। ৩০ জুলাই ২০২০ সেন্টার-এর আয়োজনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হায়দার আলী খান 'বঙ্গবন্ধু, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা : সামাজিক যৌক্তিকতা এবং বর্তমান সময়ের পাঠ' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। জুম লিংকে আয়েজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতাটি সেন্টার ফর দ্যা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজে সম্প্রচার করা হয়। ১৪ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জুমে বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

চলচ্চিত্র ও শ্রুতি-দৃশ্য: বাংলাদেশ লকডাউন হবার প্রাক্কালে পূর্ণ উদ্যমে 8th LiberaionDocfest Bangladesh-এর প্রস্তুতি চলছিল। করোনা পরিস্থিতিতে শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয় সবকিছু। নতুন পরিস্থিতিতে উৎসবের আয়োজক তরুণেরা নিয়ে আসে নতুন ভাবনা। অনলাইনে Exposition of Young Film Talent 2020/ Story-telling Lab for Documentary Filmmakers শিরোনামে পাঁচ দিনের ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে ২০২০। বাংলাদেশের ১৩ জন তরুণ নির্মাতা এতে অংশ নেন।

গত ১১ থেকে ১৩ মে ২০২০ তিন দিনব্যাপী আয়োজন করা হয় অনলাইনে এক মিনিটের চলচিত্র নির্মাণ কর্মশালা। এতে অংশ নেন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা, সিলেট মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল, পিরোজপুর, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বরিশাল ও সাতক্ষীরা থেকে ২৭ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক।

লকডাইন বাস্তবতায় এবারের বিশ্ব জাদুঘর দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন যখন অসসম্ভব ব্যাপার ছিল তখন ট্রাস্টি মফিদুল হকের তত্বাবধানে এবং শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় প্রথম বারের মতো ভিডিও প্রেজেন্টেশনের ধারনাকে সামনে নিয়ে আসা হয়। ১৫ মে আমাদের নির্মিত বিশ্ব জাদুঘর দিবসের ভিডিও কন্টেন্ট অনলাইন মাধ্যমে দেশী-বিদেশী দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। ১৬ থেকে ২০ জুন দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম অনলাইন ডকুমেন্টারি ফেস্টিভাল 'অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সকল প্রকার অনলাইন অনুষ্ঠান এবং অনলাইন প্রদর্শনীর ভিডিও কন্টেন্ট নির্মাণ ও অনলাইন মাধ্যমে প্রদর্শনী এবং প্রচারে শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিল। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে- ৬ দফার প্রদর্শনী, বজলুর রহমান স্মৃতি পদক বিতরণ অনুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুর ও ছন্দের ঝঙ্কার শীর্ষক প্রদর্শনী, আবৃত্তি অনুষ্ঠান 'শ্রাবণের পঙক্তিমালা' উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ, ২৭ আগস্ট ২০২০ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র 'অ্যা ম্যান্ডলিন ইন এ্যাক্সাইল' ফেসবুকে প্রিমিয়ার। যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফেসবুক মাধ্যমে কোন চলচিচত্রের বিশ্বজনীন প্রদর্শনীর উদ্যোগ।

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি ৷
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি ৷৷

সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক
তোমাদের স্মরি ৷৷

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জিয়াউদ্দিন তারিক আলী গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কোভিট-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী আটজন ট্রাস্টির অন্যতম ছিলেন তারিক আলী। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হয়ে ওঠে তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আগারগাঁওয়ে বিশালকার নতুন জাদুঘর নির্মাণ কাজের তিনি ছিলেন প্রধান সমন্বয়ক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অবকাঠামো ও কর্মধারার সবখানে জড়িয়ে আছে তাঁর হাতের ছোয়া।

আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিমনা এই ব্যক্তিত্ব জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ ও ছায়ানটের নির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবহ কর্মকাণ্ড এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হলো।

তাঁর কর্মের প্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাবে– এটাই আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি তাই রয়ে যাবেন আমাদের স্মৃতিতে ও কর্মে।

মানবিক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তারিক আলী

যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী তার প্রতি গভীরভাবে অনুগত ছিলেন। তার সকল কর্মকাণ্ডে এই রাষ্ট্র, সমাজ যেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। সেই লক্ষ্য থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এই লক্ষ্যগুলো যদি অর্জিত হয় তাহলেই বাংলাদেশে একটি মানবিক সমাজ গড়ে উঠবে। রাজধানীর সেগুনবাগিচার ভাড়া বাড়িতে যখন জাদুঘরটি গড়ে উঠলো, তখন স্বপ্ন ছিল একটি স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ে তোলার। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আগারগাঁওয়ে প্রায় এক একর জমির ওপর বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয়েছে। এই ভবনটির নির্মাণ কাজের সময় তারিক আলী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব ছিলেন। এই সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি নিজে সমন্বয় করেছেন। এই জাদুঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের একটি সৌভাগ্য যে তারিক আলী একজন বিশ্বমানের প্রকৌশলী।

আজকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কোন পাশ দিয়ে বৈদ্যুতিক তার গেছে, কোনদিক দিয়ে পানির লাইন গেছে, সেখান থেকে শুরু করে যদি এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতি মুহূর্তে তারিক আলীর কথা স্মরণ হবে। কারণ এই সবকিছু তার নখদর্পণে ছিল। তার সবচেয়ে আবেগের জায়গা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষিত হলে সে সময়কার যে গণহত্যা এবং বীরত্বপূর্ণ কাজগুলো ঘটেছে, সেটি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। এটি ছিল তার মূলমন্ত্র। তিনি এতটাই নিরলসভাবে কাজ করতেন যে প্রায় প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গিয়েছেন।

তারিক আলী তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাঙালি সংস্কৃতি বিশেষ করে সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি সবসময় মনে করেছেন যে বাঙালি সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছিল। বুলবুল ললিতকলা একাডেমির সাবেক শিক্ষার্থী তিনি, কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বার্থে যুক্ত হয়েছেন ছায়ানট এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সঙ্গে। দরাজ গলায় গান গাওয়া এবং সংগীত সম্পর্কে গভীর বোধ ছিল তার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমাজে প্রতিষ্ঠার একটি বড় লক্ষ্য তার ছিল। সেই লক্ষ্য থেকেই প্রায় ৩ দশক ধরে তিনি সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার মর্মবাণী হচ্ছে সকল ধর্ম, সকল প্রান্তিক জনগণের সমধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন নামে যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তাদের যাত্রা শুরু হয় ২০০১-০২ সালের নির্বাচনের পর। এ সময়ে বিভিন্ন এলাকায় যে সাম্প্রদায়িক হামলা হয় সেখানে তিনি সংগীতগুণী ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে গিয়ে এই নির্যাতিত মানুষদের উদ্ধারে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বাইরে এটাকেই প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। দেশের এমন কোনো প্রান্ত নেই, যে প্রান্তে তিনি যাননি। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের পরে কিংবা আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন এবং আমৃত্যু সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি।

তারিক আলী খুব আবেগ প্রবণ মানুষ। আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জাতীয় সংগীত গাইতাম তখন সাধারণভাবেই তিনি নেতৃত্ব দিতেন। 'মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি' এই লাইনটি গাওয়ার সময় প্রতিদিন তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো। তারিক আলীর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুধু তার মূল উদ্যোগীকে হারালো তাই নয়, আমাদের ধারণা বাংলাদেশ একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বীরচিত্ত একজন মানুষকে হারিয়েছে।

ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

লেখাটি সমকাল পত্রিকায় ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রকাশিত লেখার অংশ

আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে...

রবীন্দ্রনাথের এই পঙক্তিটিকে আপ্তবাক্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রচার বিমুখ নিভৃতচারী তারেক আলী। জিয়াউদ্দিন তারেক আলী আমার মামা, আমার মা-খালাদের একটি মাত্র ভাই। আমার মনন ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের ক্ষেত্রে আমার মা ও মামা তারেক আলীর বিশাল অবদান রয়েছে। মামাকে দেখে আমি বিস্মিত হতাম কেননা, শারিরীক অসুস্থতা উপেক্ষা করে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিরন্তর কাজ করে যেতেন। দেশ সেবার কাজ করতেন, দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যেতেন যখনই কোনো মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটতো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনের জন্য যখন নতুন জমি পাওয়া গেল তিনি এসে শিশুর মতো তাঁর আবেগ আমাদের পরিবারের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। এর আগে সেগুন বাগিচায় যতবারই আমি জাদুঘর পরিদর্শনে গিয়েছি ততবারই বলতেন, 'মলি তুই আমাদের জাদুঘরের কার্যক্রমে একটু সম্পৃক্ত হলে ভাল হয়।'

আমি আমার শিক্ষকতা পেশার ব্যস্ততার দরুণ মামার কথায় অনুপ্রাণিত হলেও সময় দিতে পারিনি। তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন যখন তিনি দেখলেন যে আমি ও আমার একজন ছাত্রী বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগারগাঁওয়ের উপস্থাপনা নিয়ে কাজ করছি। আমার দুর্ভাগ্য কাজটির সমাপ্তি তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশমাতৃকার সেবার অনুপ্রেরণা তাঁর কৈশোর বয়সেই জাগ্রত হয়েছিল। আমার মা গতকাল বলছিলেন, 'দাদা ভাই সব সময় আমাদের শিখিয়েছেন জাতীয় পতাকার যথাযথ সম্মান করতে। সূর্যোদয়ের সাথে পতাকা তোলা যেমন জরুরী তেমনি সূর্যাস্তের সাথে পতাকা নামিয়ে নেয়াও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনভাবেই যেন পতাকা শিশিরে ভিজে না যায়।'

আমার মা'র কাছে শুনেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীর ডাক, বাঙালি জাতির স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার,

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তারিক ভাই

খুব দূরের মানুষ সম্পর্কে লেখা যেমন কঠিন, আবার খুব কাছের মানুষ সম্পর্কে লেখাও কঠিন। তারিক ভাই ছিলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ।

কত লেখা বের হচ্ছে তারিক ভাইকে নিয়ে। যে তারিক ভাইকে আমি জানি, তিনি কোনদিন ভাবেননি, তাঁর প্রয়াণে মানুষ তাঁর কথা এভাবে মনে করবে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁকে স্মরণ করবে হাজারো মানুষ, এরকমটা ভাবেননি তারেক ভাই কখনই।

তিনি দেশকে ভালোবেসেছেন নিজের তাগিদে, কোন স্বীকৃতি পাবার আশায় নয়। তাই নিজেকে কোনদিন খুব বড় করে দেখেননি। সেই রকম কোন কাজের কথা উঠলে (যেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে জাদুঘরের জন্য যোগাযোগ করতে হবে), তিনি বলতেন 'এই কাজটা মফিদুল কিম্বা নূর করতে পারবে'। তিনি যে ছোট বড় সবার হৃদয়ে সেই স্থান করে নিয়েছিলেন, সে রকম ভাবনা তাঁর মধ্যে মোটেও ছিল না।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে Walk the talk। অর্থাৎ তুমি যা বলছ, তোমার জীবনের পথ চলা যেন সেই কথাটা ব্যক্ত করে। তারিক ভাই যা বলেছেন, তিনি সেইভাবে পথ চলেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ের দেশপ্রেম ও তার প্রকাশ একইরকমভাবে থেকে গিয়েছিল তাঁর মধ্যে। বয়সের সাথে সেই প্রকাশ বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে পালটেছে। মাঝে বেশ কটা বছর তারিক কর্মের সূত্রে দেশের বাইরে ছিলেন। হিসেব করে দেখলাম তিনি দেশে ফিরেছন প্রায় ১৫ বছর পর অথচ '৭১-এর ঝোড়ো দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। অনেক বন্ধন জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁর দেশকে।

'মুক্তির গানের' সেই পুরু চশমা পরা যুবকটি রয়েছিল তাঁর মধ্যে জীবনের শেষ দিন অবধি। তাই তো জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গিয়ে কেঁদে ফেলতেন, কেঁদে ফেলতেন আরও সব মুহূর্তে; পতাকা উত্তোলনের সময়, বা সংখ্যালঘুদের নির্যাতিত হতে দেখলে।

তারিক ভাইয়ের মধ্যে বাস করেছে একজন অতি আধুনিক মানুষও বটে। আমাদের ছেলেমেয়ে বড় করার সময়, তাদের নিজেদের মতো করে গড়তে চেয়েছি। অথচ একজন আধুনিক মানুষের মতো তারিক ভাই তাঁর নিজের সন্তানদের তাদের মতো করে বড় হতে দিয়েছেন। এ রকম উদার মনোভাব খুব কম মানুষের মধ্যে থাকে। তাঁর মেয়ে ছোট বেলায়, একদিন খুব কেঁদেছিল, এই কথা ভেবে যে, ওর বাবা-মা একদিন মারা যাবে। পৃথিবীতে আর থাকবে না। সেই ছোট্ট মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়ে তারিক ভাই বলেননি, 'মা দেখ আমি আছি, থাকব তোমার পাশে সব সময়'। তিনি ছোট্ট সন্তানটিকে বলেছেন 'মা, আমরা যখন বুড়ো হবো, তত দিনে তুমিও বড় হবে। তোমার বিয়ে হবে সন্তান হবে, তোমার জীবনে আরও অনেক কিছু থাকবে যা নিয়ে তুমি ব্যস্ত থাকবে, বাবার মৃত্যু তোমাকে এত কষ্ট দেবে না'। আজ তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর মেয়ে এই কথাগুলো স্মরণ করে, তখন বাবার ব্যাপারে তার এবং সেই সাথে পাঠকদেরও সম্মান বেড়ে যায়। একজন মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে যেতে পারেন বলেই এমন কথা বলতে পারেন। অনেকটা এরকম বাবা বলেই মনে করেন সন্তানের সকল চিন্তার, সকল অস্তিত্বের মাঝখানে সবখানে বাবা বিরাজ করবে, অবস্থান করবে, সেই রকম অধিকার তার নেই। এই রকম দেশপ্রেমে আবেগী, ভালবাসায় সিক্ত অথচ আধুনিক মানুষ ছিলেন তারিক ভাই।

বন্ধু তারিক ভাইয়ের কথা আজ থাক। আমার জন্য সেটা অনেক আবেগময়। আমাদের বাসায় তাঁর শেষ আড্ডা। যখন করোনার লক্ষণ দেখা দিল তাঁর মধ্যে, নিজের শরীরের খবরের পাশাপাশি তিনি মেয়েকে জানিয়েছেন যে তিনি আমাদের বাড়িতে সঙ্গে ছিলেন দুই দিন আগে।

মৃত্যুর ১২ ঘণ্টা আগে তিনি আমাদের আশার বাণী দেন ভিডিও মেসেজ-এর মাধ্যমে 'We will get together very soon!'

আমরাও খুব আশা করেছিলাম, যে আপনি ফিরে আসবেন। আপনি সব আশা ভঙ্গ করে চলে গেলেন। আশ্রুসিক্ত চোখে জানাই 'বিদায়'।

সারা যাকের
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আমাদের তারিক ভাই

৭ তারিখটা, ৭ই সেপ্টেম্বর, ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ৮ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে চুপচাপ বসে আছি, রাতে ঘুমও ভাল হয়নি। আমাদের বাড়িতে কাজকর্মে সাহায্য করে যে ছেলেটি সে 'প্রথম আলো' পত্রিকা হাতে করে এনে তারিক ভাইয়ের ছবিটা দেখিয়ে বলল 'আমি তো তারে চিনি। দরজা খুইলা দিলেই জিজ্ঞাসা করত, কেমুন আছ? জোরে জোরে কথা কইতো আর জোরে জোরে হাসত। খুব ভাল মানুষ আছিল'।

আমার মনে হলো ওর ঐ সহজ সরল উক্তির মধ্য দিয়ে জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সম্পর্কে সব কথা যেন বলা হয়ে গেল। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, আপাদমস্তক বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সদা জাগ্রত জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সবকিছু মিলিয়ে একজন অসাধারণ ভালো মানুষ।

ভাবছিলাম কবে দেখা হয়েছিল তারেক ভাইয়ের সঙ্গে? স্বাধীনতার পরে পরেই যতদূর মনে হয় ছায়ানটের অনুষ্ঠানে। মাহমুদুর রহমান বেনু সংগীতশিল্পী, শিক্ষক, গান পাগল এক মানুষ। তারই সুবাদে পরিচয়। ছায়ানটে তখন অনেক তরুণ শিল্পী আলো ছড়াচ্ছেন। একজন শিল্পীর প্রতি তারিক ভাইয়ের পক্ষপাত ছিল বেশী। তাই তাঁর কোন অনুষ্ঠান থাকলে তারিক ভাইয়ের উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। এসব নিয়ে বন্ধুরা তাঁকে নানা রসিকতায় বিদ্ধ করত।

তারিক ভাই নিজেও গাইতেন। প্রশিক্ষিত গায়ক। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে তাঁর গান শেখা। পরবর্তীতে ছায়ানটের সঙ্গে তাঁর বন্ধনটি অনেক সুদৃঢ় হয়েছিল। আমরা অনেকে যাঁর ভাবশিষ্য সেই অতুল্য মানুষ ওয়াহিদুল হকের কারণে এবং কিছুটা মিনু আপার (সন্‌জীদা খাতুন) সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধতার কারণে।

'৭৫-এর পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হলাম। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলুণ্ঠিত করা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার কদর্য অপচেষ্টা- এসব আমাদের প্রচণ্ড পীড়া দিত। আর তারিক ভাই শুধু পীড়িত নয়, মনে হয় তার বুকের ওপর দিয়ে কেউ বুলডোজার চালিয়ে দিচ্ছে। কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। মনে হতো হাতে অস্ত্র পেলে তিনি আরেকবার মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ওই অস্থির সময়কালে সব আন্দোলনে, পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে যে আন্দোলন, সর্বত্র তিনি প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলেন।

আমরা কয়েকজন বন্ধুপ্রতিম মানুষ, সমমনা, অভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, ভাবলাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কীভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে।

প্রথমে সিদ্ধান্ত হয় আমরা গণকবর ও বধ্যভূমিগুলোকে সংরক্ষণ করব এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহোদর রাজাকার আলবদরদের হত্যা আর নির্যাতনের কথা তুলে ধরব। সে চিন্তা থেকে আমরা দেখতে গেলাম কুল্লাপাথরের শহীদদের গণকবর এবং চুকনগরের বধ্যভূমি। আরো দু'য়েকটি স্থানে গিয়েছিলাম। বিশদ মনে নেই। কিন্তু আমরা অনুধাবন করলাম এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ যা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে প্রায় অসম্ভব। আমরা আবার আলোচনায় বসলাম। এবার সিদ্ধান্ত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়া। খুব ছোট করেই শুরু হোক।

সেগুন বাগিচায় ভাড়া বাড়িতে যাত্রা শুরু জাদুঘরের। উদ্বোধনী দিনের কথা মনে পড়ে। প্রচণ্ড বৃষ্টি। রাস্তার ওপর মঞ্চ, সামিয়ানা বাতাসে, বৃষ্টিতে ধ্বংসস্তূপ। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিল্পীরা গাইছেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। নীচে বৃষ্টিতে ভিজছে কয়েকশত মানুষ। বৃষ্টির ধারা, আর আমাদের অশ্রুজল আনন্দে-বেদনায় মিশে এক হয়ে গেল। সেদিন তারিক ভাইকে দেখেছি ছেলে মানুষের মত কাঁদতে।

জাদুঘর গড়ে তোলার পেছনে কতটা শ্রম তারিক ভাই দিয়েছেন আমরা সবাই জানি। সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন জাদুঘরের জন্য। তারিক ভাইয়ের জীবনের প্রায় সকল সময়টা দিয়েছিলেন জাদুঘরের জন্য। জাদুঘরই হয়ে দাঁড়াল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় আনুকূল্যে যখন গড়ে উঠছিল নতুন ভবন, তখন এর নির্মাণে তারিক ভাইয়ের জীবন পুরোটাই জড়িয়ে গেল। জাদুঘর তার প্রতিদিনের কর্মস্থল হয়ে দাঁড়াল। অসুস্থ হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তাই ছিল।

তারিক ভাই যন্ত্রপ্রকৌশলী, লাহোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন। তাঁর অন্যতম সহপাঠী ছিলেন চট্টগ্রামের ইঞ্জিনিয়ার মোশররফ হোসেন, আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী। আমরা তারিক ভাইকে পাকিস্তানি বলে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতাম। তারিক ভাই রেগে ওঠার পরিবর্তে হো হো করে হাসতেন আর পাঞ্জাবি ভাষায় দুর্বোধ্য সব কথা বলতেন। সেগুলো সঠিক পাঞ্জাবি ভাষা কিনা জানি না, কিন্তু বেশ উপভোগ করতাম সবাই। অথচ মানুষটা ছিলেন আপাদমস্তক পাকিস্তান বিরোধী।

বন্ধুবৎসল, প্রাণবন্ত তারিক ভাই আমাদের যে কোন আড্ডায় সবচেয়ে কাঙ্খিত মানুষ। গানে, গল্পে আবেগে মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। হঠাৎ হঠাৎ করে জয় বাংলা বলে চিৎকার করে উঠতেন। একদিন আমাকে বললেন, 'জানো আমি আর জাতীয় সংগীত গাইতে পারি না। দু'লাইন গাইবার পরই বুক ভেঙ্গে কান্না চলে আসে। এত কথা মনে পড়ে, এত রক্ত, এত কান্না, এত স্বজন হারানোর স্মৃতি এই জাতীয় সংগীত- গাইতে পারি না।'

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী দেশের জন্য এক বুক ভালবাসা নিয়ে ফিরে গেলেন বাংলাদেশের মাটির কোলে। তারিক ভাইয়ের স্মৃতি বহন করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিটি ইট, জাদুঘরের প্রতিটি মানুষ। বেঁচে থাকবেন তারিক ভাই জাদুঘরের প্রতিটি গ্যালারিতে, ছবিতে অনন্তকাল।

আসাদুজ্জামান নূর,
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

গাঢ় দুই দৃশ্য

শামসুর রাহমানের এক কবিতার শিরোনাম ‘কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে’ বারবার মনে পড়ে আমাদের তারিক ভাইয়ের কথা যখন ভাবি, দীর্ঘ সময় একসাথে পথচলার তো কত স্মৃতি কত কথা কত গান। তার নির্যাস বের করা, নিকষিত হেম তুলে আনা সহজ কোনো কাজ নয়। তারিক ভাইয়ের পরিচয় বিশাল এক নবীন প্রজন্ম, বলতে গেলে দুই প্রজন্ম, চেনে ‘মুক্তির গান’-এর আবেগী অথচ সংগ্রামী তরুণ হিসেবে। আমাদের পথচলা তো আরো আগের থেকে। ষাটের দশকের শেষাশেষি এই তরুণ প্রকৌশলী যখন সঙ্গীতান্দোলনে নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন, পড়াশোনা শেষ করেছেন পাকিস্তানে, সেই ঘেরাটোপে সংস্কৃতিই ছিল তাঁর বাঁচার অবলম্বন। ঢাকায় ফিরে পেশায় যোগ দিয়েছেন যত না, সংস্কৃতিতে বুঝি তার চেয়েও বেশি, হয়ে যান ওয়াহিদুল হক, আমাদের সবার দাদাঠাকুর, এর অনুসারী। তাঁকে ক্ষেপিয়ে বেড়াতে হয় না, তিনি নিজেই ক্ষ্যাপার মতো ছুটে চলেন, গানের সম্মেলক আয়োজনে, গণসঙ্গীতের স্কোয়াডে, রাজপথে ট্রাকে গানের দলের সদস্য হয়ে, আরো কত-না উদ্যোগে। ছায়ানটের বাইরের বৃত্তের তিনি, তবে হয়ে ওঠেন ছায়ানটেরও একজন।

এরপর মুক্তিযুদ্ধ, সে-ইতিহাস তো আমাদের প্রজন্মের জীবনের অলৌকিক উদ্ভাসন, যেখানে ট্রাকে মুক্তির গানের শিল্পীদলের গান নিয়ে ছুটে-চলা কোনো ব্যতিক্রম ছিল না, ছিল একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানেও পেছনে ছিলেন ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুন, যাঁদের কোনো উপস্থিতি প্রামাণ্যচিত্রে নেই। স্বাধীনতার পর আমরা চলেছি নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে, মুক্তির স্বপ্ন চুরমার করে দিতে আঘাত এসেছে বারবার, নিজেদের আত্মতৃপ্ত বিভ্রান্ত অবস্থান পরিস্থিতি করেছে আরো জটিল। ১৯৭৫ সালে পরিবারের সদস্যসহ বঙ্গবন্ধুর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্বপ্ন দলিত-মথিত করে দেয়ার বেদনা বুকে নিয়ে আমরা পথ চলেছি। তারপরও তো ঘুরে দাঁড়াবার ইচ্ছার কোনো মৃত্যু নেই।

১৯৯৬ সালে আট সহকর্মী সহযাত্রী মিলে যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হয়, সর্বস্তরের মানুষের সহায়তার হাত প্রসারিত হলো জাদুঘরের প্রতি, তখন থেকে সূচিত হয়েছিল আরেক স্বপ্নযাত্রা। এই যাত্রাপথে আমরা পেছনেই থাকতে চাই, কেননা আমরা তো মনেপ্রাণে জানি ও বিশ্বাস করি বহু মানুষের বহু ধরনের অবদান, সহায়তা ও অংশীদারিত্বে গড়ে উঠছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তারিক ভাই বোধকরি এটা জানতেন সব থেকে বেশি, তাই তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোতে আনা, মঞ্চে আসন দেয়া ছিল দুঃসাধ্য কাজ। প্রতিবারই জোর-জবরদস্তিভাবে এটা করতে হতো। তাঁর এমন অবস্থান কোনো বিনয় ছিল না, ছিল বিশ্বাসের জায়গা থেকে। যে-কারণে ‘মুক্তির গান’ যখন আবার মুক্তিযুদ্ধ ফিরিয়ে আনলো তরুণ প্রজন্মের কাছে, তখন মুখ্য চরিত্রের মানুষটিকে কোনো আনুষ্ঠানিক সভা-সমাবেশে দেখা যায়নি, প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে কোনো সাক্ষাৎকার বা মিডিয়ার আলাপচারিতায় তিনি বিশেষ যোগ দেননি। সেইসাথে তিনি বিপুল আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজে, প্রকাশ্যে নয়, অপ্রকাশ্যতায়। এই কাজের এক প্রধান আশ্রয় হয়েছিল যখন নতুন জাদুঘরের নির্মাণ কাজ শুরু হলো। ২০১০-১১ সালে আগারগাঁওয়ের প্রশাসনিক এলাকায় জমি পাওয়ার পর ২০১৭ সালে নির্মিত জাদুঘরের উদ্বোধন, বিশাল নান্দনিক ভবনের মাথা উচুঁ করে দাঁড়ানো মুক্তিযুদ্ধকে আবার দিল উন্নত শির। ভাস্কর যেমন ছেনি দিয়ে পাথর কেটে কেটে মূর্ত করে শিল্পরূপ তেমনি এক ভূমিকা ভবন নির্মাণে পালন করেছেন তারিক আলী। কত শত ধরনের সিদ্ধান্ত, তদারকি, সংগঠন ও উদ্ভাবন মিলিয়ে চলে এই কাজ, যেখানে আরো আছেন সুহৃদ স্থপতি, প্রকৌশলী, নকশাকারসহ আরো কতজনা। তারিক ভাই আসেন সাইট-অফিসে, নির্মীয়মাণ ভবনে, তারপর নির্মিত জাদুঘরে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, গাড়ি থেকে নামেন, হাতে ব্যাগ ও একতোড়া কাগজ নিয়ে। ভবন যখন দেখি, তার পেছনে এমন এক দৃশ্য আমি দেখতে পাই, সবাই দেখেন সাফল্য, আমি দেখি শ্রম, আর দেখি তারিক ভাইকে।

The Liberation War Museum's education program at a school outside of Dhaka.

আরো এক দৃশ্য আমার কাছে গাঢ় হয়ে আছে। এটা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনেক ধরনের কাজের একটি ঘিরে। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের বাসের সঙ্গী হয়ে জেলা-উপজেলায় কর্মসূচি পালনের সময় সেখানে থাকতে প্রবলভাবে উৎসাহী ছিলেন তারিক আলী। এই উৎসাহের একটি বড় কারণ ছিল এই সুবাদে দূর গ্রাম ও ছোট শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাওয়া। আকুল হয়ে তিনি আহ্বান জানাতেন শিক্ষার্থীদের অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার জন্য।

আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক অন্তরঙ্গ আদান-প্রদানেও তিনি সচেষ্ট হতেন। তার এক সুন্দর ছবি আছে আমাদের কাছে, এখানে যেটির প্রতিলিপি দেয়া হলো। From Memory to Action শীর্ষক এক পুস্তিকায় ছাপা হয়েছে ছবি। পুস্তিকার প্রকাশক নিউইয়র্কস্থ International Coalition of Sites of Conscience এবং ব্রাজিলের Ministry of Justice. ইরেশনি নাইডু এর প্রণেতা এবং সহ-প্রণেতা বিক্স গ্যাব্রিয়েল ও মফিদুল হক। তো সচিত্র পুস্তিকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যে-অংশ রয়েছে তাতে বিশেষ একটি ছবি আছে তারিক আলীর। আমাদের দেয়া ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের অনেকগুলো ছবি থেকে উদ্যোক্তারা এমন একটি ছবি বেছে নিয়েছিল। ছবিটি আমারও খুব প্রিয়, এই ছবিতে বিশেষ করে আমি পাই শিক্ষার্থীদের মধ্যকার তারিক আলীকে। হৃদয় ছোঁয়া অন্তরঙ্গ এক মুহূর্তের ছবিটি বলে অনেক কথা।

মফিদুল হক
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

গানের মানুষ প্রাণের মানুষ

জিয়াউদ্দিন তারিক ভাইয়ের চলে যাওয়ায় তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হচ্ছে পত্র পত্রিকায় এবং সামাজিক মাধ্যমে। যারা তাঁর সাথের সাথী, সকলেই নিজেদের মনের উপর এই চরম আঘাত বারবারই প্রকাশ করছে।

আমি পারিনি। একটা শব্দও আমার কলম থেকে বের হয়নি এ ক'দিন। ছবির মত আমার শৈশবের, কৈশোরের, তারুণ্যের, যৌবনের দেখাগুলো ভেসে উঠছে বার বার। তারিক ভাই সেই জন, যিনি মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার অকুতোভয় যোদ্ধা। যাঁর দিকে তাকালে আমরা দেখি, বুকভরা দেশপ্রেম আর বিজয়ের সংকল্পে দৃপ্ত এক যুবক।

যুদ্ধ শেষে তাঁকে দেখি অশ্রু সিক্ত চোখে নৌকা থেকে এক পা নেমেই সদ্য ভূমিষ্ট বাংলাদেশের ভেজা মাটি পরম মমতায়, শ্রদ্ধায় হাতে তুলে নিতে। ওয়াহিদুল হকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, সংগীত সাধনা এবং দেশের সর্বত্র ছুটে গিয়ে সমমনা শত মানুষের সাথে মিলে আপন সংস্কৃতি চর্চায় দিন রাত্রি যাপন করেছেন। ছায়ানট ও রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের কাজে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। সংগীত তাঁর শিরায় শিরায় প্রবহমান ছিল, যে কোন আড্ডায়, গানের আসরে, হারমোনিয়ামটি থাকতো তাঁর হাতে। রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন খোলা কণ্ঠে, শুদ্ধ, সুন্দর, নিখুঁত সুরে। আসরে তিনিই মধ্যমনি। কিছু কিছু গান যু-বরাজ এবং আমাকে বারবার গাইতে বলতেন। আমরাও তাঁর অনুরোধে সারা রাত গানের পরে গান গেয়ে যেতাম।

শাস্ত্রীয় সংগীত ও বিশুদ্ধ বাংলা গান, তাঁকে মুগ্ধ করতো এমনই, যে কোন অনুষ্ঠান বা ঘরোয়া আসরে তারিক ভাইয়ের উপস্থিতি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো। শিল্পীকে যথাযথ সম্মান ও মুগ্ধতা প্রকাশে তাঁর জুড়ি ছিল না, কারণ তিনি তো সংগীতের গভীরের মানুষ এবং বোদ্ধা শ্রোতা।

আমার বাবা সাংবাদিক রেজাউল হকের বাড়িতে তাঁর ছিল নিত্য আসা যাওয়া। আমার মা এবং আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে এমনই হাসি ঠাট্টা চলতো যার মধ্য দিয়েও দেখতে পেতাম একজন অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমী দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধাকে। আর আমার গত পাঁচ বছরের ডায়ালাইসিসের জীবনে তারিক ভাইয়ের মনোকষ্ট, প্রায় আমার মা-বাবার মতনই ছিল। মাঝে মাঝেই আমাকে ফোন করে কিডনি চিকিৎসার নতুন কোনো তথ্য থাকলে জানাতেন। আমি তাঁর চিন্তায়, ভাবনায় সবসময়ই ছিলাম। বাবা মা চলে যাওয়ার পর আমার জন্য তিনি একটা আশ্রয় ছিলেন, সেটা আমি আজ হারিয়েছি। একজন অন্যরকম মুক্তিযোদ্ধা তারিক আলী, আমৃত্যু তাঁর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি মুক্তিযোদ্ধাই রয়ে গেলেন।

মিতা হক
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী

আমাদের প্রিয় তারেক ভাই

২০২০ এ আমরা অনেক সাংস্কৃতিক কর্মীকে হারিয়েছি। তারেক ভাইও তাঁদের মধ্যে একজন। তারেক ভাইকে চিনি '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। ছায়ানটে প্রায়ই আসতেন, আর অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকতেন। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা ও স্নেহময় এক ব্যক্তিত্ব। বারবারই আমি বড়দের কাছ থেকে স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি। তারেক ভাইয়ের কাছ থেকেও তার কমতি ছিল না। মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে বারবার। মুক্তির গানেও তারেক ভাই ছিলেন প্রাণবন্ত এক টগবগে যুবক। শরণার্থী ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে গিয়ে কথা বলা, কে কোথায় কোন সেক্টরে যুদ্ধ করছে সে সব খোঁজ খবর নেয়া, শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করা, তাদের সান্ত্বনা দেয়া, আশার বাণী শোনানো। সংগঠন থেকে নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। খাওয়ার ঠিক ছিল না, নাওয়ার ঠিক ছিল না। কিন্তু মনের শক্তি ও সাহস ছিল প্রচুর। মাঝে মাঝেই জয় বাংলা বলে চিৎকার করে স্লোগান দিতেন। আমরা সবাই তাঁর সাথে যোগ দিতাম। সারাক্ষণ এক সাথে থাকা, গান তোলা, অনুষ্ঠান করা, সবাইকে একসাথে করা, স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন সবাইকে।

নভেম্বর মাস। খুব ঠাণ্ডা, ট্রাকে করে আমরা মুক্তাঞ্চল যশোরের পথে রওনা দিলাম। আমরা ট্রাকে ১২ জনের মত ছিলাম। গ্রামে গ্রামে থেমে থেমে আমরা একটু বিশ্রাম করেছি, গান শুনিয়েছি তাদের অনুরোধে। একবার এক গ্রামে ভোরের বেলা আমরা সবাই মুখহাত ধোবার জন্য কাছেই একটা পুকুর ছিল সেখানে গেলাম। চারদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন। খুব শীত। হঠাৎ দেখি তারেক ভাই ঐ ঠাণ্ডা পুকুরে স্নান করার জন্য নেমে পড়েছেন। মানে ডুব দিচ্ছেন। আমরা সবাই অবাক। আমাদের অনুরোধে তাড়াতাড়ি করে উঠে এলেন। ট্রাকে তারেক ভাইয়ের কাছে গ্রামবাসীরা একটি টিয়া পাখি, খাঁচাসহ দিয়েছিলেন। আর সারা পথ তারেক ভাই টিয়া পাখিকে 'জয় বাংলা' বলতে শেখাচ্ছেন। সবাইকে হাসি মজা করে মাতিয়ে রাখতেন।

শেষ কথা মাহমুদুর রহমান বেনু যখন ঢাকায় এলেন তখন আমরা শারমীন মুর্শেদের 'ব্রতীতে' আবার একসাথে হলাম। দেখা হলেই বলতেন, 'কিরে তুই কি আর বুড়া হবি না' বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধনের দিন একসাথে আমরা সবাই সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলাম। আপনি আমাদের সবার অন্তরে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। মুক্তির গান যুগের পর যুগ প্রজন্মরা দেখবে, তাদের দেশ গড়ার কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবে ও আপনাকে মনে করবে।

শাহীন সামাদ
সদস্য, মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা ১৯৭১

তারেক ভাই ও একটি ময়না পাখির খাঁচা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তখন সেগুন বাগিচায় পুরোনো দোতলা বাড়িতে। বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পা রাখতেই মনে হতো গোটা ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে অন্য এক জায়গা। একান্ত নিজের, ভিতরে কেউ যেন অপেক্ষা করছে। প্রবেশ পথেই শিখা চিরন্তন ...

অঙ্গীকার মা মাটির কাছে ... বাংলার রক্তভেজা মাটি, সাক্ষী আকাশের চন্দ্র-তারা, ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি, ভুলবোনা কিছুই আমরা। সরু সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় নিরিবিলি উঠে যাওয়া। সেই শব্দে পুরোনো বাড়িটিকে ঘিরে কিছু গাছপালায় আশ্রয় নেয়া পাখিদের চঞ্চলতা, কলো-কাকোলিতে মুখোর হয়ে ওঠা। সেই বাড়িতে ক'টাই বা ঘর। সে খানেই পঁচিশ বছর আগে ফেলে আসা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মনিমুক্তা তুলে এনে গুছিয়ে রাখতে শুরু করেছেন সেই তাঁরা, মহান '৭১-এ যাঁরা ছিলেন রণাঙ্গনে। দেখি সেই মানুষদের। সেখানে আর কাউকে দেখি না। না দল না সরকার। যেটুকু আছে তাকেই ভালবেসে আকড়ে ধরার আকুলতা। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি– এই বোধ থেকেই সে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিতে চান নতুন প্রজন্মের হাতে।

ভেতর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই ছোট্ট একফালি উঠোনে পা। উঠোন প্রান্তে উন্মুক্ত মঞ্চ– সেখানেই চলছে মুক্তির উৎসব– মুক্তির গান। সে কবেকার কথা!

মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান .../ যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে, স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভুমি...

দরদ ভরা কণ্ঠ ছুঁয়ে যায় শ্রোতাদের অলিন্দ। তারেক ভাই জানতে চাইলেন কারা গাইছে? ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন কাছে গিয়ে। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রীদের সাথে পরিচিত হলেন। পরম শ্রদ্ধায় বললেন আমাদের জেঠামনি শহীদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তার পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহা রবির কথা। রবিদা তারেক ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। মমতাময়ী শ্রীমতী বৌদি (রবিদার স্ত্রী) প্রতিভাদি (ভাষা সৈনিক প্রতিভা মুৎসুদ্দি) তাঁর প্রিয় মানুষ। কুমুদিনীর প্রকৃতি নিরন্তর প্রাণ টানে তাঁর। অসাম্প্রদায়ীক তারেক ভাইও ছিলেন কুমুদিনী পরিবারের কাছে প্রিয় মানুষ। পুজো-পার্বণে, আনন্দ-উৎসবে ছিলেন পরিবারের সাথী। সে দিন অনুষ্ঠান শেষে মেয়েদের রওনা করানো পর্যন্ত হাসিমুখে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তারেক ভাই পরম আত্মীয়ের মতো। এতোটা সময় দিলেন, এতো গল্প করলেন, গান শোনালেন, কে তিনি? মেয়েদের প্রশ্ন।

মির্জাপুরে ফিরে তাদেরসহ ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের দেখালাম "মুক্তির গান" ছবিটি। পিনপতন নীরবতায় ভরে আছে হলটি। হঠাৎ এক ছাত্রী কিছু একটা আবিষ্কারের আনন্দে চিৎকার করে বলছে– ময়না পাখির খাঁচা হাতে তারেক ভাই। আমি চিনেছি, চিনেছি। তারেক ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। সঞ্চালকের কণ্ঠও তাঁর। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি। মেয়েটির আনন্দ দেখে আমার চোখে জল চলে আসে।

সে দিন তাদের সাথে দেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বপ্নদ্রষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মফিদুল হক, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, রবিউল হুসাইন, ডাক্তার সারওয়ার আলী, সারা যাকের, আলী যাকের, আক্কু চৌধুরীসহ আরো মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। সকলেই স্নেহভরে ছাত্রীদের সাথে কথা বলেছেন। এ কাহিনি তারেক ভাইকে যখন বলি তখন তাঁর চোখ ছলছল করতে দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধটা যেন তাদের জেগে থাকে। বাংলাদেশের নজীরবিহীন গণহত্যার ইতিহাস তারা যেন কখনো ভুলে না যায়। তারেক ভাই আমৃত্যু এই স্বপ্ন দেখে গেছেন।

'শোক থেকে শক্তি' অদম্য পদযাত্রা– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় হাঁটি এক মাইল– এ পদযাত্রায় আমরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করছিলম। ২৬ মার্চ ২০২০-এর মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রতিবারের মতো যাত্রা শুরুর স্থান জাতীয় শহীদ মিনার। ইচ্ছে ছিল সেখানে আবার দেখা হবে সবার সাথে। আমরা মিলিত হবো স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে। কিন্তু না। করোনা ভইরাস এখন আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপন, সামাজিকতা সবকিছুরই নির্ধারক হয়ে গেছে। আমারা এ বছর মার্চ মাসের আগে একটিবারের জন্যও ভাবিনি যে, এরপর থেকে জীবন ঘুরে যাবে ভিন্ন পথে। একে একে হারাতে হবে আমাদের স্বজনদের।

একে একে মাটির খাঁটি মানুষগুলো চলে যাচ্ছেন। তাঁরা দল-মতের বাইরে থেকে আমাদের স্বপ্ন পূরণের একটি ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই ঘরটিকে কেন্দ্র করেই আমরা খুঁজে নেবো আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাই রবিউল হুসাইনকে! মুক্তিযোদ্ধা ভাই জিয়াউদ্দিন তারেক আলীকে!

হেনা সুলতানা
শিক্ষক, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

তারিক ভাই : শুধু হাসি বেঁচে রয় আর কিছু নয় তো

হা তারিক ভাই ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ আপনাকে বিদায়ের পর থেকে আমার স্মৃতিতে আপনার সরল শিশুসুলভ হাসি ছাড়া আর কিছুই তেমন মনে পড়ছেনা। আপনার চলে যাওয়ার বেদনা অথবা অন্য কোনো স্মৃতি, কিছুই না শুধুই একজন শিশুর মতো তারিক ভাইয়ের সরল হাসি। কখনো জোরসে হাসি, কখনও মৃদু-মিষ্ট-উচ্ছ্বসিত হাসি জাদুঘরের লবিতে, ক্যান্টিনে, আউটরিচ কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের সাথে। সকল স্থানে সহাস্যে আপনি বিরাজমান। একে আমি কি বলবো, কি করে সম্ভব? বিজ্ঞানে এর কি ব্যাখ্যা আছে আমার জানা নেই। শুধু এটুকুই বুঝতে পারছি-

ওই শিশুসুলভ হাসিটুকু আপনার জীবনের সত্য,

সরলতা আপনার সৌন্দর্য এবং এই দুয়ে মিলেই আপনার অস্তিত্ব

কঠিন রুপে সহজিয়া

তারিক ভাই আপনার সম্পর্কে এই বিষয়টি আমার থেকে ভালো কেউ জানেনা। শৈশবে হিন্দু হিসেবে ক্লাসে বুলিইং এর স্বীকার হওয়া মন্টু তার নামের প্রথ মাংশ শ্রী বাদ দেয়াসহ নামের নানান সংস্করণ ভাবতো। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পাঠ্য বই হিন্দু ধর্মের বদলে ওর ইসলাম ধর্ম শিক্ষা নেয়ার গল্প আপনার সাথে শেয়ার করেছিলাম। শেয়ার করেছিলাম ওর দুঃখি মায়ের গল্প। আপনি আবেগী হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে যখনই মন্টু কোনো কাজ নিয়ে উনার কাছে গিয়েছে, প্রতিবারই মন্টু স্নেহের আবেশ নিয়ে ফিরেছে।

আমার ধারণা মন্টুর তারিক ভাইকে সমাহিত করা পর্যন্ত তারিক ভাইয়ের সাথে থাকার বিষয়টি তাদের দুজনের মধ্যকার সম্পর্কের অধিকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। মন্টু আমার কাছে অনুমতি চাইবার সময় ওর দৃষ্টিতে একটা শীতল দৃঢ়তা ছিলো। ওর মনের অবস্থা এবং সম্পর্কটি উপলব্ধির জন্য এই যথেষ্ট।

আর্কাইভ ও প্রদর্শনী টিমের বেশ কজন কে আপনি তাদের ক্রাইসিস পিরিয়ডে টাকা ধার দিয়েছেন। কখনওবা ভ্রমণ আনন্দ উপভোগের জন্যও দিয়েছেন অর্থের যোগান। একজন আহমেদাবাদের ইয়ুথ ক্যাম্প শেষে ঘুরাফেরার অনুমতি চাইলো। আপনি আরও কিছু যায়গা ভ্রমণ করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনার খরচ বেড়ে যাবে। দুশো ডলার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেন ফিরে গিয়ে ফেরত দিলেই হবে।

একদিন তিনতলার চিলেকোঠায় ডকুমেন্টেশন সেন্টারে ঢুকে আমাকে আপনি এখনো ছুটির দরখাস্ত দেননি কেন? টেবিলে অসমাপ্ত নানান কাজের চেকলিস্ট দেখিয়ে বুঝাতে সক্ষম হলাম। একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে তারিক ভাই- দুই লাইনে একটা কিছু লিখে দে রে মা। জীবনের প্রথম এবং শেষ তুই আর মা বলে সম্বোধন। কারণ তিনি কাউকে তুই সম্বোধন করতেননা। আর জাদুঘরের সকলের মধ্যে ভাই-বোন এর সম্পর্ক বিরাজমান।

দোল পূর্ণিমায় বাড়িতে পুজো শেষে মন্টু আবির নিয়ে আসে প্রতি বছর। সেই আবির লুকিয়ে রাখা হয়। লুকিয়ে এ উৎসব পালনের মজাই অন্যরকম। টিমের সদস্যরা একে অন্যকে আবির মাখিয়ে মুখ রাঙা করে তোলে। গত তিন বছর আমাদের এই আনন্দের সহযাত্রী ছিলেন তারিক ভাই। প্রথমবার ওদের সবার আবির মেশানো হাত পেছনে লুকিয়ে বোর্ড রুমে প্রবেশ। তারিক ভাই সবাইকে দেখে অবাক মুহুর্তে নানা রঙে মাখানো ওদের লুকিয়ে রাখা হাত তারিক ভাইয়ের মুখ রঞ্জিত করে তুললো। আর তারিক ভাইয়ের সেই সরল হাসি

তারিক আলী : নতুন প্রজন্মের প্রতি

জাদুঘরের আ উটরিচ কর্মসূচিতে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তারিক ভাইয়ের প্রথম উক্তি-

আপনাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে

তারিক ভাই ছাড়া এই কথাটি আর কোনো ট্রাস্টি এতটা জোর দিয়ে বলতেন না।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় উক্তি-

এই দেশ শুধু হিন্দুর না, এই দেশ শুধু মুসলিমের না, এই দেশ শুধু বৌদ্ধ অথবা খৃস্টানের না। এই দেশ আমাদের সকলের। এই দেশ এদেশে জন্ম নেয়া প্রতিটি বাঙালির। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এই বাঙালি

সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করেছি। এই যে ফিল্ম দেখলেন, কিরকম ছেড়া লুংগি পরে খালি গায় গ্রামের কৃষক, দিনমজুররা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছে। আপনাদের এই বাঙালি সংস্কৃতি ধরে রাখতে হবে।

এই কথাগুলো বলার সময় কেউ যেন বার্তাটি শুনতে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত হতে চাইতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কথা বললে তিনি রাগ হয়ে বলতেন আপনারা চুপ না করলে আমি কথা বলবোনা। নতুন প্রজন্মের বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ করে ধর্মান্ধতাকে অতিক্রম করে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠার বিষয়টিকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন।

শিল্পীর ক্লান্তি নেই, নেই কোনো বয়স

তারিক ভাই ভালো গাইতেন আমরা সবাই জানি। তবে গত কয়েক বছর ধরে প্রায়শই তাঁর গলার স্বর নাই হয়ে যেত, কখনও মৃদু-ভাঙা থাকতো। মাঝেমধ্যে তরুণ কোনো গ্রুপের সাথে পরিচয় করানোর সময় বলতাম তিনি মুক্তির গানের মোটা চশমা পড়া সেই তরুণ। মুহুর্তেই তারা উৎসাহী হয়ে নানান জিজ্ঞাসায় ব্যাস্ত করে তুলতে তারিক ভাইকে। শীতকালীন কোমড়ের ব্যাথায় বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো তারিক ভাই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে ফিরে যেতেন তাঁর সোনালী অতীতে। কেউ আবদার জুড়ে দিত একটি গান গাইতে। আমি বেশ ভীত হয়ে যেতাম। গাইতে পারবে তো তারিক ভাই? বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে ভাঙা গলায় তিনি শুরু করতেন লম্বা টানের উচু স্কেলের গান। প্রানান্তকর চেষ্টায় শতভাগ শুদ্ধ করে গাইতেন একই যোশ এবং উচ্ছাসে। শেষে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বিদায় নিতেন তৃপ্তির হাসি নিয়ে। শিশুদের মতো মুখে মুচকি মুচকি সরল হাসি নিয়ে মাথা কিঞ্চিৎ নিচু করে তরতর করে হেঁটে যেতেন।

যতবার এরকম ঘটেছে প্রতিবারই আমার উপলব্ধি হয়েছে, শিল্পীর ক্লান্তি নেই এবং নেই কোনো বয়স।

শিশু-অন্তর এক কর্মবীর

আমরা যারা কাছের মানুষ শুধু তারাই জানি নিয়ম মেনে সততার সাথে কাজ করা কঠোর কর্মবীরের অন্তরে এক শিশুর বাস। সেই মানুষটি তারিক ভাই। জাদুঘরের অনুষ্ঠান চলাকালীন নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন তিনি অন্য এক শিশুর অবতার। আশে-পাশের কেউ নেই, কিচ্ছু নেই আপনার মনে। শুধু অনুষ্ঠানের ভিতরের এক চরিত্র হয়ে উঠেন আপনি। এক শিশু অবতার আপনার প্রাণে ঠাঁই করেছে, সেই চেহারা আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি স্বাক্ষী হিসেবে সেই মুহূর্ত আমি তুলে ধরেছি আপনার অলক্ষ্যে। কমাস আগেই WHO-এর বরাত দিয়ে বল্লাম, আপনারা এখন তরুণ। আরো বিশ বছর আমাদের নির্দেশনা দিবেন। আপনি হেসে বল্লেন, এইটা ভালো বলেছেন আমেনা। আরো বিশ বছর বাঁচবো তাহলে। তারিক ভাই, আপনি বিশ্বাস করেছিলেন। আপনি যা বিশ্বাস করেন তা শিশুর মতো সরলভাবে বিশ্বাস করেন। আমি আপনার এই শিশুর সারল্য মনে রাখতে চাই। মুখের কথা দিয়ে নয়, আপনার কাজের মাধ্যমেই ধরে রাখবো আপনাকে।

আমেনা খাতুন
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদদের পাঠানো শোকবার্তার অংশ

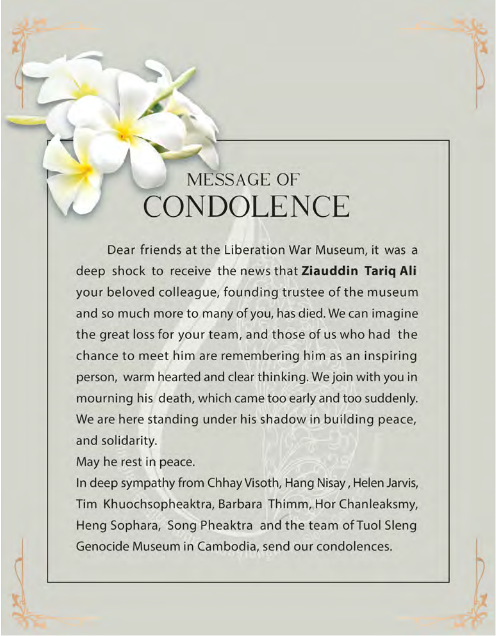

MESSAGE OF
CONDOLENCE

Dear friends at the Liberation War Museum, it was a deep shock to receive the news that **Ziauddin Tariq Ali** your beloved colleague, founding trustee of the museum and so much more to many of you, has died. We can imagine the great loss for your team, and those of us who had the chance to meet him are remembering him as an inspiring person, warm hearted and clear thinking. We join with you in mourning his death, which came too early and too suddenly. We are here standing under his shadow in building peace, and solidarity.

May he rest in peace.

In deep sympathy from Chhay Visoth, Hang Nisay , Helen Jarvis, Tim Khuochsopheaktra, Barbara Thimm, Hor Chanleaksmy, Heng Sophara, Song Pheaktra and the team of Tuol Sleng Genocide Museum in Cambodia, send our condolences.

I was very sad to hear of the passing of Tariq Ali. It is a very great shock. Only about 2 months ago he phoned me to check about my health and I thanked him for being so thoughtful. “Well, you see, we were born in the same year and so I needed to check on you”, he said.

He was always the person to ensure that I was invited to the annual Freedom Fighters Get-Together at Dhaka Club.

Please pass on my condolences to Tariq Ali’s family and be assured that I am also thinking of the Trustees and Staff of the Liberation War Museum at this time.

Warm wishes, **Julian bhai**

I am deeply saddened by the news of Tariq Ali. Please send my condolences to everyone in the museum and thinking of you all.

Pia Conradsen

I have just heard about my good friend Tariq. So very Sad. He was a gift to us all.

Patrick Burges

Sending my deepest condolences for Tariq Bhai’s death. This is a very deep loss and must be very tough for you.

NayanikaMookherjee

ধ্রুব জ্যোতি

আমাদের জীবনের সর্বকালের বিস্ময়কর অর্জন হল আমাদের 'স্বাধীনতা'। ১৯৭১ সালের এক বিভীষিকাময় যুদ্ধে আমরা যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম, নিজ মাতৃভূমিকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সেই যুদ্ধের সহযোদ্ধা ছিলেন আমাদের তারিক ভাই।

কলকাতার ৪৪নং ধর্মতলা স্ট্রিটে অবস্থিত 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' ১৯৭১-এর যুদ্ধ চলাকালীন সময় এক বিরাট অবদানের গর্বিত অংশিদার ছিলন তিনি। এই সংস্থাতেই আমাদের সকলের পরিচয় তারিক ভাইয়ের সাথে। সহযোদ্ধা-শিল্পী হিসেবে তারিক ভাই সকলের সাথে অনায়াসে মিশে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে একজন বিনম্র- বন্ধুসুলভ তরুণ যুবক হিসাবেই দেখেছিলাম। তারিক ভাই 'মুক্তির গান' শীর্ষক তথ্যচিত্রের একজন উল্লখযোগ্য অংশগ্রহণকারী। স্বাধীনতাওোর সময় তারিক ভাইকে আমরা সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে পেয়েছি। সাংস্কৃতিক অঙ্গণে বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি তার আধুনিক ধ্যান-ধারণা। একাওরের অভিযাত্রায় যে লক্ষ্যে সামিল হয়েছিলেন, তারিক ভাই শেষ দিন পর্যন্ত সে লক্ষের জন্য লড়ে গেছেন। স্বাধীন-সার্বভৌম-ধর্মনিরপেক্ষ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষে।

এই বীর মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের' একজন সম্মানিত ট্রাস্টি। তাঁর মেধা ও মননশীলতা তাঁকে সারা জীবন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করে রাখবে। তাঁর কর্মের ভেতর 'যুদ্ধাপরাধী' বিচারের দাবীতে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সোচ্চার। গোলাম আযমের প্রতিকী বিচার কার্যেও তিনি ভূমিকা পালন করেছিলেন। একদিকে অন্তরে লালন করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অপর দিকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছেন বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। সকল গুণী- প্রতিষ্ঠিত- মেধাবী ব্যক্তির প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। সবাইকে তিনি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতেন। সুযোগ পেলেই সবাইকে একত্রিত করতে নিরলস পরিশ্রম করতেন ।

তারিক ভাইকে আমরা সারাজীবন এক নিভৃতচারী বন্ধু ও ধ্রবজ্যোতি বলে মনে রাখবো

"শুভ্র সমুজ্জল, হে চির নির্মল
শান্ত অচঞ্চল, ধ্রুব জ্যোতি ॥

ডালিয়া নওশিন
সদস্য, মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধের ফেরিওয়ালা

মুক্তিযুদ্ধের ফেরিওয়ালা হ্যান্ডসাম এই মানুষটির সাথে প্রথম দেখা ২০০২ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সপ্তাহব্যাপী বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের শেষ দিনে। কথা বলার সুযোগ হয়নি সেদিন। শুধু জেনেছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আটজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টির একজন জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। ২০০৪ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে পঞ্চগড় জেলায় অবস্থানকালীন ভিতরগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় "মুক্তির গান" চলচিত্র প্রদর্শনীর সময় সহকর্মী আব্দুল মতিন জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্যার সম্বন্ধে আরও কিছু জানালেন। তারিক আলী স্যারকে কাছে থেকে জানার সৌভাগ্য হয় ২০০৫ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার তেতইগাঁও রসিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী দিনে।

১৮ জুলাই, দলের সাথে মৌলভীবাজার থেকে এক সঙ্গে শ্রীমঙ্গল এসে নামলাম ঢাকা থেকে আগত দলের পথ প্রদর্শনের জন্য। তারিক আলী স্যারের নেতৃত্বে দল শ্রীমঙ্গলে এসে পৌছায় সকাল সাড়ে দশটায়। তারপর পুনরায় তেতইগাঁও রসিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্দেশে যাত্রা। দলে স্যারের আরও সহযাত্রী ছিলেন ট্রাস্টি, স্থপতি কবি রবিউল হুসাইন, হাসান আহামেদ ও কথা সাহিত্যিক রশীদ হায়দার। বেলা সাড়ে এগারটার দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌছানোর সাথে সাথে রনজিত কুমার দা, প্রধান শিক্ষক ও সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা স্বাগত জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে নিয়ে গেলেন। প্রধান শিক্ষকসহ সম্ভবত নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে রনজিত কুমার দা ঢাকা থেকে আগত দলের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর স্যার শ্রেণি কক্ষ থেকে বের হয়ে আমাকে বললেন যারা ইতিমধ্যে প্রামাণ্যচিত্র দেখেছে আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই। আমিও ব্যবস্থা করে দিলাম। স্যার শিক্ষার্থীদের সাথে কথা শুরু করলেন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান নিয়ে। আমরা গাড়ি এবং প্রামাণ্য প্রদর্শনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর তারিক স্যারের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি স্যার শ্রেণি কক্ষে নেই। অন্য কক্ষে আছে কি-না তা দেখার জন্য একটু এগোতেই দেখি মাঠের এক কোনে জটলা। জটলা দেখার জন্য এগিয়ে গিয়ে দেখি তারিক স্যার শিক্ষার্থীদের সাথে ঘাসের উপর বসে গান শুনছেন এবং সুরের ভুলগুলো শুধরিয়ে দিচ্ছেন। দূর থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম কত সহজ সরলভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে আনন্দ করছেন তিনি।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে অঞ্চলে অবস্থান তিনি সেখানেই ছুটে গেছেন। নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে শুনছেন এবং তাদেরকে শুনিয়েছেন ১৯৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনী ও এ দেশীয় দোসরদের নির্মতার কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা। মনে প্রাণে অহিংস চেতনাকে লালন করে বলে ২০০৬ সালে নোয়াখালীতে গান্ধীর পদরেখা ধরে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনীকালে সোমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে উপস্থিত এবং শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা। তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন সাতক্ষীরা, খুলনা, দিনাজপুর, গাজীপুর, বরগুনা, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছে। মুক্তিযুদ্ধের ফেরিওয়ালার আরেক রূপ জেনেছি ২০১০ সালে ভারতে গুজরাটের সবরমতি গান্ধী আশ্রমে সপ্তাহব্যাপী 'যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালা' অংশ গ্রহণের সময়। গুজরাটে পৌছানোর পর তিনি আমাদের অভিবাবক, পিতা যেমন সন্তানের খবর রাখতেন তেমনি স্যার সকাল সন্ধ্যা আমাদের খোঁজ খবর নিতেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা, আউটরিচ

পিতৃতুল্য তারিক স্যার

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, এই নামটার কথা মনে হলে চোখের সামনে জেগে ওঠে সেই হাসিমাখা মুখখানি। তাঁর মন ছিল শিশুর মতো কোমল। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর সাথে আমার পথ চলা ছিল দীর্ঘ পাঁচ বছরের। এই পাঁচ বছরে তাঁর কাছ থেকে আমি জীবনের অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, যা আগামী দিনের পথ চলাকে আরো সুদৃঢ় ও সহজ করে দিয়েছে। তিনি ছিলেন আমার পিতৃ তুল্য। একজন পিতা তাঁর সন্তানকে যেভাবে হাতে ধরে পথচলা শেখান, তেমনি তিনিও আমাকে কিভাবে পথ চলতে হবে তা শিখিয়েছেন। তিনি সব সময় ছোট-বড় সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতেন। তিনি আমাকেও 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলতেন। এ ছাড়া আমার সহকর্মী সুমাইয়াকেও 'আপনি' করে বলতেন। তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী। তিনি সব সময় আমাকে নতুন কিছু শিখতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি সবসময় তা অন্যকে দিতে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সাথে বেশি দিন পথ চলা হলো না আমার। মহামারি করোনা তাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। তাঁর চলে যাওয়াতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারে এক শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর না থাকার অভাবটা জাদুঘর পরিবার সবসময় উপলব্ধি করবে। তিনি যেন আমাদের একজন অভিভাবকের মত সবসময় মাথার উপর ছায়ার মত ছিলেন। যে কারও কোন সমস্যা হলে তিনি সবসময় সাহস ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তিনি যখন আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন আমি শুনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল তিনি এই মাত্র জাদুঘরে আসবেন। তাঁর নিথর দেহ যখন হাসপাতাল থেকে জাদুঘরে নিয়ে আসলাম তখন মনে হচ্ছিল তিনি আমার সাথে জাদুঘরে যাচ্ছেন। এমনকি তাঁকে যখন জাদুঘর থেকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখনও মনে হচ্ছিল তিনি আমার সাথে আছেন। দাফন সম্পন্ন করে চলে আসছিলাম তখন মনে হচ্ছিল এ আমি কাকে রেখে যাচ্ছি। এই মানুষটা এখানেই কি সারা জীবন থাকবেন, আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল। আমি সেখান থেকে আর আসতে পারছিলাম না, আমি শুধু কান্না করছিলাম। তখন মন্টু ভাই, শরিফুলসহ অন্যরা আমাকে বুঝিয়ে সেখান হতে নিয়ে আসেন। আমি যে মানুষটাকে হারিয়েছি সে মানুষটাকে আর কখনো দেখতে পাবো না। তাঁর কথা যতই বলি না কেন কম বলা হবে। জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্যারের কথা এই ছোট লেখার মধ্যে শেষ করতে পারব না। তাই বলতে চাই তিনি যেখানেই থাকেন যেন ভালো থাকেন।

সাগর শিকদার
মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার

একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক, সাতক্ষীরার মোজাহার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের শম্পা গোস্বামীর ফোন যখন ৯ সেপ্টেম্বর রাতে গ্রহণ করলাম ২০ সেকেন্ড তিনি কিছু বলতে পারেননি। কান্নার শব্দ শুনলাম এবং বুঝতে পারলাম, তিনি ভালোবাসার একজন মানুষের প্রয়াণে কষ্ট পেয়েছেন। ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর মৃত্যুর পর শম্পা গোস্বামী তা বুঝতে পারেননি। মনে করেছেন, এই নামে অন্য কেউ। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছেন না। ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেছেন, ‘একদিন আমার কাছে সাতক্ষীরার সংখ্যালঘুদের কথা জানতে চাইলেন তিনি। অকপটে বললাম, ’৪৭-এর পর এদেশ থেকে যে তাদের যাওয়া শুরু হয়েছে তা আজও অব্যাহত আছে। সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশে কোথাও ঠাঁই নেই। সাতক্ষীরাতে এ সমস্যা আরও বেশি। হঠাৎ আমার হাত ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, কেন যাবে তাদের জন্মভিটা ছেড়ে? সবাই এভাবে চলে গেলে আমরা কাদের নিয়ে থাকবো? কী যে এক আস্থা পেয়েছিলাম তার কাঁপা কাঁপা হাত দুটোর স্পর্শে! সাহস পেয়েছিলাম ঢাকায় গেলেই তাঁর সাথে দেখা করার। খুব বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলাম।’

সংখ্যালঘুদের এই আস্থার প্রতীক জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। তাঁর মৃত্যুর পর যতজন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন, প্রায় সকলেই বলেছেন, একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে জীবন পার করেছেন তিনি। শুধু হিন্দু বা বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি নয়, বরং সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার দায় তিনি বহন করেছিলেন। আর এর জন্য তিনি প্রায় অসমর্থ একটি দুর্বল শরীর নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশময়। যখনই যেখানে সংখ্যালঘু শ্রেণির উপর আক্রমণ-নির্যাতন ঘটেছে, তখনই সেখানে হাজির হয়ে নির্যাতিতদের পাশে থেকেছেন পরম মমতায়। সাংগঠনিকভাবে এজন্য তিনি যুক্ত ছিলেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন-এর সাথে। গত প্রায় ২৫ বছর তিনি এই সংগঠনের সাথে থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে শুরু হয় সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন-এর কার্যক্রম। তখন থেকেই তিনি এর সাথে যুক্ত। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বরে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই পদে বহাল ছিলেন।

জিয়াউদ্দিন তারিক আলীকে আমি চিনি কিন্তু জানি না। দীর্ঘদিন কাছে থেকে কাজের সুযোগ পেলেও জানার সুযোগ হয়নি। একদিন কথায় কথায় বলছিলেন, বরিশালে তাঁর জন্মস্থানের একটি এলাকায় ’৪৭-এর পর থেকে কোনো হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়নি। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে এবং তাঁর মতো একজন নিভৃতচারী বিপ্লবীর এটাই বিস্ময়কর অবদান। মানুষকে ভালোবাসার প্রতিফল এটা, সাম্প্রদায়িক নয়, একান্তই জীবে প্রেমের প্রমাণক।

কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ঘটেছে। যেহেতু জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদের পিছনে ধর্মকে এঁটে দেয়া হয়েছে তাই তিনি ধর্মীয় আচরণ দেখলে সন্দিহান হয়ে ভুল অনুমানের শিকার হয়েছেন। বস্তুত মানুষকেই তিনি ভালোবেসেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে এবং যেটা বলতেন বার বার, ‘বিজ্ঞানমনস্ক’ নজরে। সংখ্যালঘুদের তিনি প্রশ্রয় দিতেন আলাদা করে নয়, কারণ তারা বঞ্চিত ছিল, সেখানে একটা সমতাবিধানের প্রয়াস চালাতেন সহায়তার মাধ্যমে। এ নিয়ে হাসিঠাট্টাও কম হয়নি। আমেরিকার নিউ জার্সিতে বসবাসরত তাঁর বন্ধু সুজন দাশগুপ্ত লিখেছেন, ‘এখানে ওকে জানতাম, রবীন্দ্র-ভক্ত, গান পাগল এবং সুলেখক হিসেবে। যদিও নিজেকে সুলেখক মানতে চাইত না। ... অনেক কথা মনে পড়ছে এলোমেলোভাবে। মাঝে মাঝে যখন বাংলাদেশে ওকে ফোন করেছি, “কী খবর তারিক ভাই? কোথায়?”

“এই তো বনানীতে পুজোপ্যান্ডেলে এসেছি।” পরে বাংলাদেশেরই কে জানি আমাকে বললেন, তারিক প্রত্যেক পুজোয় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়ে– নানান পুজোমণ্ডপে হাজিরা দেবার জন্য।

তিনি আরও লিখেছেন, ‘একবার ফোন করেছিলাম নিউ জার্সির প্যাটার্সনে বাংলাদেশী ইমিগ্রেন্টদের অনেকের নানান রকম অসুবিধা হচ্ছে- সে ব্যাপারে সাহায্যের জন্য। ... শমীতা অনেক সাহায্য করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর একার পক্ষে অসম্ভব, এগিয়ে আসা দরকার কোনও বাংলাদেশী সংস্থার, যারা সিলেটি ও অন্যান্য বাংলা ডায়ালেক্টে স্বচ্ছন্দ। তারিকের কি কোনও কন্টাক্ট আছে?’

“আচ্ছা সুজন-দা, বউদির এতো মুসলমান-প্রীতি কেন?” বলেই হো হো করে হাসি। এই হল তারিক আলী। বিদায় তারিক ভাই, বিদায়!

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও কর্মসূচি

জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর স্মৃতিতে

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী– যে নামটা কিনা আমি কয়েকশত বার সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যাণ্ড জাস্টিস, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কখনো বা বক্তা হিসেবে কখনো বা সভার আহ্বায়ক হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাটা ট্রাস্টি হিসেবে তারিক স্যার আমাদের সাথে সকল ধরনের অনুষ্ঠান এবং আয়োজনে সম্পৃক্ত এবং উপস্থিত থাকতেন। তার এই সম্পৃক্ততা ও উপস্থিতি, সেন্টার এবং মিউজিয়ামের কয়েকশত তরুণ স্বেচ্ছাসেবককে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি যদি কোন কাজ হাতে নিতেন বা করতেন, তাহলে সেটায় তিনি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে পড়তেন, যেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার পদচারণা শুরু করে ১৯৯৬ সালে সেগুন বাগিচায় আর সেন্টার তার কার্যক্রম শুরু করে ২০১4 সালে। যাত্রার শুরু থেকে সেন্টারের সকল কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় ট্রাস্টিগণ এবং জাদুঘরের কর্মীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের অপরিসীম ভালবাসা এবং সহায়তা ছাড়া সেন্টার একটি নাম ব্যতীত আর কিছুই না।

বিগত ছয় বছর ধরে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যাণ্ড জাস্টিস, উইন্টার স্কুল পরিচালনা করে আসছে, যেটা সাতদিনব্যাপী একটি আবাসিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম, যেখানে দেশি-বিদেশী শিক্ষানবীশরা গণহত্যা এবং এর বিচার নিয়ে শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক উইন্টার স্কুল গ্র্যাজুয়েট, তারিক স্যারের সাথে করা চমৎকার সেশনটার কথা মনে রেখেছে। সেশন এর আগে, ‘মুক্তির গান’ প্রামাণ্যচিত্রের স্ক্রিনিং হয়, যেখানে তারা ১৯৭১ সালের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয় এবং দেখে কিভাবে একদল যুবক-যুবতী, যারা কিনা তাদেরই বয়সের, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাংলাদেশ শরণার্থীদের সাহস যোগাচ্ছে এবং আশা ভরসা দিচ্ছে। ঐ যুবক যুবতীদের কর্মকাণ্ড নতুন প্রজন্মের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। উইন্টার স্কুলের অংশগ্রহণকারীরা খুব অবাক হয়ে যেত, যখন তারা জানতে পারতো যে প্রামাণ্যচিত্রের এই ২১ বছরের যুবক, যে কিনা এই যুদ্ধবিগ্রহ এবং সংগ্রামের ধারাভাষ্য দিচ্ছে, উনি আর কেউ না, আমাদের মাঝে উপস্থিত তারিক আলী স্যার। তারিক স্যার, এক রাত আমাদের সাথে থাকতেন এবং সবার উৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কাউকে নিরাশ করতেন না। যখন তিনি ‘মুক্তির গান’ কিভাবে তৈরি হলো, এসব নিয়ে আগ্রহ ভরে আলাপ করতেন, তখন তাঁর চোখে মুখে আবেগ, দেশপ্রেম এবং দুঃসাহসিকতা ভেসে উঠতো। সামনের উইন্টার স্কুলগুলো নিয়ে ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছে, এগুলো কখনোই আগের মতো হবে না, আমরা তাঁর শূন্যতা সর্বদা অনুভব করবো।

তারিক স্যার একজন চমৎকার শ্রোতা ছিলেন। পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার চাইতে উনি শ্রোতাদের সাথে এককোণে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভালবাসতেন। কোন প্রোগ্রাম শেষ হলে, স্যার ব্যাকস্টেজ-এ আসতেন এবং সকল স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ দিতেন, যেটা কি না খুবই বিরল। এরকম বিভিন্ন স্নেহশীল আচরণের মাধ্যমে তারিক স্যার আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন, হোক সেটা কোন সদয় আচরণ বা নিজের কর্মক্ষেত্রের প্রতি ভালবাসা। প্রথম উইন্টার স্কুলের একজন গ্র্যাজুয়েট, শেখ রাইসুল ইসলাম, স্যারের সাথে তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘ইনি আমাকে শিখিয়েছেন যে ছাত্র এবং শিক্ষকের একসাথে খাওয়া উচিৎ, আলাদা টেবিলের কোন দরকার নেই।’ তারিক স্যার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে গিয়েছেন। তিনি ট্রাইব্যুনালের সকল মামলার গতি-প্রকৃতির খোঁজ খবর রাখতেন আর বাদীপক্ষ (প্রসিকিউশন)কে অভিনন্দন জানাতেন। আবার সেন্টারের কোন স্বেচ্ছাসেবক যখন কোন ট্রেনিং বা কোর্স করার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতো স্যার এতে খুবই খুশি হতেন এবং গর্ববোধ করতেন। একবার তারিক স্যার আমাদের বলেছিলেন, ‘সহিংসতা এবং গণহত্যার শিকার হিসেবে আমরা যখন আমাদের অভিজ্ঞতা বাইরের পৃথিবীর কাছে সুচিন্তিত এবং সুন্দর উপায়ে তুলে ধরছি, এটা দেখলে আমার খুব ভালো লাগে।’

স্যারের জীবনের মূলমন্ত্র আমাদেরকে ভবিষ্যৎ-এ কাজ করার সাহস এবং উদ্দীপনা যোগাবে। সেন্টার আরো একবার, তাঁর সর্বোচ্চ সম্মান এবং ভালোবাসা জানাচ্ছে এই মানুষটার জন্য যিনি আমৃত্যু সেন্টারের একজন প্রকৃত সমর্থক ছিলেন।

নওরীন রহিম
কো-অর্ডিনেটর, সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যাণ্ড জাস্টিস

গান দিয়ে চেনা তারেক ভাই

আকস্মিক খবর পেলাম তারেক ভাই নেই। বিশ্বাস হচ্ছিল না। করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন সে খবরও জানা ছিল না। একে একে আপন জনেরা চলে যাচ্ছেন। দৃঢ়চেতা, দেশপ্রেমিক মানুষগুলোই আমাদের প্রেরণা। সামনের দিনগুলোতে এমন ভরসা করার মত মানুষ ছাড়া আমাদের চলবে কীভাবে? জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সূত্রে কিশোর বয়সে তাঁকে দেখেছি, দেখেছি পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা; তখনকার টিএসসি, বাংলা একাডেমি বা শিল্পকলা একাডেমির সম্মেলনগুলোর আন্তরিক পরিবেশে তাঁর উপস্থিতি। সবচেয়ে বেশি করে বুঝেছি তাঁর সঙ্গীত প্রীতির কথা। শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদুল হককে তিনি গুরু মানতেন। তারেক ভাইয়ের গান শুনলে তা পরিষ্কার বোঝা যেত। ছিপছিপে গড়নের মানুষটাকে ভীষণ আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়েছে। তাঁর প্রাণ ঢেলে গান গাওয়ার ভেতর যে আন্তরিকতার পরশ পেয়েছি তাতে ধন্য হয়েছি। কতবার ভেবেছি একদিন শুধু তারেক ভাইয়ের গানের আসর হবে। আর হলো না। এ আক্ষেপ কোনোদিন যাবে না।

তারেক ভাইয়ের অনেক গল্প শুনেছি মিতা আপার (শিল্পী মিতা হক) কাছ থেকে। মিতা আপার বাবা সাংবাদিক রেজাউল হকের নিত্যসহচর ছিলেন তিনি। জীবন-দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য সব নিয়ে তাঁদের আদানপ্রদান। দুই পরিবারের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল। রেজাউল হকের মৃত্যুর পর এক ঘরোয়া স্মরণ সভায় আমাকে 'চোখের আলোয় দেখে ছিলেম' গানখানি গাইতে অনুরোধ করা হয়েছিল। গান শুনতে শুনতে অগ্রজ বন্ধুর বিরহে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তা এখনও চোখে ভাসছে।

সাংগঠনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাধারণ সংসদ সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সভায় তাঁর মতামত ছায়ানটের স্থির প্রত্যয় যাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালি সংস্কৃতির সেবায় তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান আমাদের প্রাণিত করেছে। নীরবে কত সংস্কৃতি কর্মীর সুখে দুঃখে যে পাশে থেকেছেন তার খবর খুব কম লোকেই জানে। আপাদমস্তক বাঙালি, দরাজমনের গানপাগল তারেক ভাইকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

লাইসা আহমদ লিসা
সাধারণ সম্পাদক, ছায়ানট

সামাজিক মাধ্যমে শোকের অংশ বিশেষ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাষ্টি, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধাদের অনুপ্রেরণাদানকারী সাংস্কৃতিক দল 'মুক্তির গানে'র সদস্য, সক্রিয় সমাজকর্মী এবং বীর মুক্তিযুদ্ধা তারেক আলীর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহতা । মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনেক আয়োজনে তাঁর আগ্রহে অংশগ্রহনের নানা সুখস্মৃতি আজ মনে ভাসছে । তাঁকে ভুলি কি করে? আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের কোষাধ্যক্ষসহ অনেক সাংগঠনিক দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আতিউর রহমান
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

পাবলিক লাইব্রেরীতে লেয়ার লেভিনের ধারণ করা ফুটেজ ও তারেক মাসুদ পরিচালিত 'মুক্তির গান' ডকুমেন্টরী দেখতে নিয়ে গিয়েছিল বাবা। সিনেমা চলাকালীণ চারপাশের দর্শকদের কান্না দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। সেদিন বয়সের কারণে বুঝতে পারিনি, সিনেমা দেখে তাদের কান্নার কারণ তবে সেদিন রূপালি পর্দায় দেখা একটি লোককে আমার খুব মনে ধরেছিল তিনি তারিক আলী। তার দরাজ কণ্ঠস্বর, টিয়া পাখির মুখ দিয়ে জয় বাংলা বলানোর চেষ্টা আর শিস বাজিয়ে, 'জয় বাংলার জয়' গানটি আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে আজও আজ তিনি চলে চলে গেলেন চির অন্ধকারের সমুদ্রে আর কোনোদিন না ফেরার গল্প হয়ে তারেক আলী আপনার মৃত্যু নেই আপনি বেঁচে থাকবেন, বাংলাদেশের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হৃদয়ে

সজীব

পুরু মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত মানুষটির মৃদু স্বরে আমরা শুনেছিলাম, মুক্তির গান।
জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, আজ চিরবিদায় নিলেন।
আমৃত্যু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একের পর এক মৃত্যু সংবাদে আমরা বিপর্যস্ত, তাঁদের শুন্যতা পূরণীয় নয়। কাত্তরে মুক্তাঞ্চলের মাটিতে পা ফেলে তিনি হাতের মুঠোয় নিয়েছিলেন জন্মভূমির মাটি। জয় বাংলা শ্লোগানটি পোষা টিয়ে পাখিকে শেখাবার চেষ্টা ছিল তাঁর। "যুদ্ধ শেষ, দেশ স্বাধীন। বিজয়োল্লাস ও উৎসবের এই আনন্দমুহূর্তেও আমার মনে পড়ছে সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের চেহারা, সেই বালকযোদ্ধার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাহনি। মনে পড়ছে বৃদ্ধ কৃষক সেই মুক্তিযোদ্ধার কথা, আমি কোনদিন ভুলবোনা গামছা মাথায় সেই স্বাধীনতার সৈনিককে, যার সাহসিকতা ছিল কিংবদন্তীর মত। কোনদিন ভুলবোনা অকুতোভয় সেই বীর শহীদদের যারা প্রাণ দিয়েছিল বিজয় ছিনিয়ে আনতে। কিন্তু এই মহৎ আত্মদানের কথা মনে রাখাই কি যথেষ্ট? প্রশ্ন তবু থেকে যায়। আমরা কি পারবো তাঁদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রাখতে? আমরা কি পারবো তাঁদের সেই মহান লক্ষ্য সমুন্নত রাখতে?"
মুক্তির গানের শেষাংশে তাঁর উচ্চারিত প্রশ্নের সুরাহা আজও হয়নি, ৭৫ বছর বয়সে জীবনের সমাপ্তি টানা মুক্তির গায়কের প্রশ্নের জবাব এবার আমাদের খোঁজার পালা। আমাদের মুক্তির গান আমাদের গাইতেই হবে।

গেরিলা ১৯৭১

ভাবতেই পারছিনা তিনি এভাবে, এতো দ্রুত চলে যাবেন। তারিক আলী স্যার এর সাথে কথা হোল ফোনে কিন্তু করোনাকাল সত্যই সব উলট-পালট করে দিল এমন দেশ-প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনচেতা শিল্পীরা যদি এতো দ্রুত চলে যান তবে দেশ সাজাবে কারা? আমাদেরকে দিয়ে যাবার তো অনেক কিছুই বাকী ছিল। গভীর শোক এবং শ্রদ্ধা

মৃদুল মামুন

আমারে যেন না করি প্রচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ সকল বিষয় তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁর মনে হয় কিছু একটা করা প্রয়োজন। আরো শুনেছি তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন, তবে তা হয়েছিল কি-না সে বিষয়ে আমার শোকাক্রান্ত মা'র স্মৃতি আজ অনেকটাই অস্পষ্ট। এই তাগিদ থেকেই তিনি লাহোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় বাঙালি ছাত্রদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তা বোধের চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আমার নানার মৃত্যুর তিন বছর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে চলে আসেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তারেক মামা ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক নতুন কর্মযজ্ঞে। আমরা জানতে পারলাম তিনি তাঁর গ্রিনকার্ডটি নষ্ট করে ফেলেছেন যাতে তাঁকে আমরা আবার যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুরোধ করতে না পারি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দু'টি কার্যক্রম নিয়ে তিনি খুব গর্ববোধ করতেন। একটি স্কুল প্রোগ্রাম, অন্যটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। ২০০৮ সালে সেগুন বাগিচার মিটিং রুমে আমার বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তিনি এ বিষয়ে বিশদভাবে আলাপ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আমার ছাত্র-ছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে যেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হয়। আমার ছোটবেলা থেকে দেখা মিতভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির মামা যেন হঠাৎ করে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিলেন, স্বপ্নের বীজ বপন করছিলেন তরুণদের মধ্যে যাতে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহিমাকে ধারণ করতে পারে।

করোনা-কালের অবসরে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছিলেন। সারাদিন গান শুনতেন। সুবিনয় রায়ের গাওয়া একটি রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত সাত দিন ধরে চর্চা করে শুদ্ধস্বরে তুলেছিলেন। করোনা-কালে অবসাদ কাটানোর জন্য কিছু দিন যাবৎ আমিও সঙ্গীত চর্চা করছিলাম। অনেক দিনের অনভ্যাস তাই তাল, লয়, দম নেয়া এ সব বিষয়গুলো তিনি ঠিক করে দিতেন। 'আমার হাত বান্ধিবী, পা বান্ধিবী, মন বান্ধিবী, কেমনে' (শাহানা বাজপেয়ীর ভার্সন)... গানটা খালি গলায় তুলতে পারছিলাম না, তিনি আমাকে তাল ও দম নেবার ব্যাপারটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ক'দিন পর কোন একটি কাজে মামার বাসায় গিয়েছি, আমাকে বললেন, শাহানা গানটি কীর্তন আঙ্গিকে গেয়েছে। ভেবে অবাক হলাম তিনি গানটি নিয়ে এতোটা ভেবেছেন। একদিন বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' চলচ্চিত্রটি দেখছেন। আমাকে বললেন, মলি নতুনভাবে সিনেমাটা উপলব্ধি করছি, সত্যজিৎ রায়কে বুঝতে পারছি।

তারেক মামা লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, হাছন রাজা প্রমুখের দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। তাঁর সবসময়ের বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এ কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

মালিহা নার্গিস আহমেদ (মলি)
অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব : www.liberationwarmuseumbd.org